করিম সেখ

শ্রীজলধর সেন

মূল্য বার আনা

২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, প্যারাগন প্রেসে, গোপালচন্দ্র রায়ের দ্বারা
মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

পূজনীয় শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়,

শ্রীচরণ কমলেষু।

মহাত্মন্,

লোকে বলে, আপনি নাকি কলিকাতা ইউনিভার্সিটীকে প্রতীচ্যের ইউনিভার্সিটীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপাদানে সংগঠিত করিয়াছেন এবং কলিকাতা ইউনিভার্সিটীতে বাঙ্গালীর ভাষা-জননী—যিনি এতদিন উচ্চশিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের নিকট অনাদৃতা, উপেক্ষিতা ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন—আজ সেই ভাষা-জননী তাঁহার আশীষপূর্ণ হস্ত আপনার মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিতেছেন "হামারি আদর তুঁহু বাড়ায়লি অব টুটায়ব কে?"

আমি বাঙ্গালা, সাহিত্যসেবক, কিন্তু ভাষা-জননীর দরিদ্র সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বড় কথার সহিত পরিচিত হইবার অবকাশ লাভ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই। দরিদ্র আমি, দরিদ্রের সুখ দুঃখের—তাহাদের অভাব অভিযোগের, তাহাদের ব্যথা বেদনার সহিত আমি আবাল্য পরিচিত।

আমার করিম সেখ দরিদ্র কৃষক। আপনি সহৃদয়, দয়াবান, আশুতোষ। আমার দরিদ্র করিম আপনার করুণালাভে বঞ্চিত হইবে না—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, করিমকে আপনার চরণোপান্তে উপস্থাপিত করিয়া, ভক্তিপরিপ্লুতচিত্তে আপনার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম।

প্রণত সেবক

শ্রীজলধর সেন।

ভূমিকা

এখন পুস্তক লিখিলেই তাহার ভূমিকা কোন হোমরাচোমরা লোকের দ্বারা লিখাইয়া লইবার রেওয়াজ হইয়াছে। কিন্তু আমার যে হোমরাচোমরা লোকের কাছে যাইতে সাহসে কুলায় না; বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, নিরক্ষর, চির-অনাদৃত, কৃষিজীবী মুসলমান যুবকের সুখ-দুঃখের কথা লিখিয়াছি; ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেও কি কেহ সে অনুরোধ রক্ষা করিতেন? তাই আমার এই বইয়েরও ভূমিকা আমিই লিখিলাম।

অনেকদিন পূর্ব্বে "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রে 'পাপের ফল' বলিয়া একটী ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম। গল্পটী ছাপা হইবার পর দেখিলাম যে, তাহার শেষাংশ ভাল হয় নাই। তখন গল্পটীর শেষাংশ নূতন করিয়া, নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়া লিখিবার ইচ্ছা হইল। লিখিতে বসিয়া শেষাংশত একেবারে নূতন করিয়া লিখিলামই, প্রথমাংশেরও অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ফেলিলাম। শেষে দেখিলাম গল্পটী ছোট ত রহিলই না, মাঝারিরও উপরে যাইয়া উঠিল। তখন গল্পটী দপ্তরজাত করিলাম—ছাপাইবার উৎসাহ রহিল না।

এমন সময় একদিন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সরোজনাথ ঘোষ আমার দপ্তরখানা তল্লাস করিয়া ঐ গল্পের পাণ্ডুলিপি বাহির করিলেন এবং তাহা পড়িয়া বলিলেন যে, আমি যদি গল্পটী পুস্তকাকারে ছাপাইতে স্বীকার করি, তাহা হইলে তিনি ইহার জন্য পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছেন। সুহৃদ্বর তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষণ

করিয়াছেন; তিনি চেষ্টা যত্ন না করিলে গল্পটী দপ্তরজাতই থাকিত। ইহার জন্য সুহৃদ্বরকে ধন্যবাদ করিতে হইবে না কি?

তাহার পর বই ছাপাইবার কথা। পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভায়া দীর্ঘজীবী হউন— আমার পুস্তক ছাপাইবার ভয় কি?—তা লোকে আমার পুস্তক কিনুন আর নাই কিনুন, পড়ুন আর নাই পড়ুন।

এখন গল্পের বই ছাপাইতে হইলেই তাহাতে ছবি দিতে হয়। ছবি প্রস্তুত করান যায় না—তবুও ছবি দিতে হইবে, এ এক বিপদ্! আমি আমার 'করিম সেখে' বর্ত্তমান প্রথা রক্ষার জন্য একখানি ছবি দিলাম; তাহা 'করিম সেখের' প্রতিচ্ছবি কি না তাহা বলিতে পারি না—তবে ছবি। ক্রেতৃগণ এই ছবি দেখিয়া করিম সেখকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না, তাহা তাঁহাদের বিচার্য্য।

কলিকাতা,
১০ই আশ্বিন, ১৩১৯।

শ্রীজলধর সেন।

করিম সেখ

[১]

ফতেপুরের রহিম সেখের বড় ছেলে করিম সেখের সহিত প্রতিবেশী এনাতুল্লা পরামাণিকের পুত্র বসিরদ্দির ছেলেবেলা হইতে বড় প্রণয়। করিম ও বসিরদ্দি একসঙ্গে খেলা করিত, একসঙ্গে একই মাঠে গরু চরাইত, দুইজনে গোপনে পরামর্শ করিয়া প্রতিবেশীর বাগান হইতে ফল চুরি করিত, দ্বিপ্রহরে মাঠের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দিয়া দুইজনে বটগাছের ছায়ায় গামোছা পাতিয়া শয়ন করিত এবং মধ্যে মধ্যে উভয়ে গলা মিলাইয়া রৌদ্রদীপ্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া মেঠোসুরে গান ধরিত

"আমার পরাণ কাঁদে বাড়ী যাই যাই কৈয়্যারে"---

সেই বৈশাখের দ্বিপ্রহরে বটবৃক্ষতলে শয়ান রাখাল-বালকদ্বয়ের পরাণ গৃহগমনের জন্য সত্য সত্যই কাঁদিত কি না বলিতে পারি না; কিন্তু সেই সময়ে দূর-দেশগামী কোন পথিক যদি প্রান্তরের পথে যাইত, তাহা হইলে, ঐ গান শুনিয়া তাহার হৃদয়ে বাড়ীর কথা জাগিয়া উঠিত এবং নিশ্চয়ই গৃহে ফিরিবার জন্য তাহার পরাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

করিম ও বসিরদ্দিকে যে কোন দিন পাঠশালায় যাইতে হয় নাই, এ কথা না বলিলেও চলে। মা সরস্বতীর সহিত তাহাদের

পূর্ব্বপুরুষের যখন কোন সংস্রবই ছিল না, তাহাদের বাপদাদারা যখন ঐ দেবীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না পাতাইয়া এতকাল সুখে সচ্ছন্দে ঘরকন্না করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তখন এই সনাতন প্রথার অন্যথাচরণ করা যে কদাচ কর্ত্তব্য নহে, একথা তাহারা বেশ বুঝিত। তাহাদের বাপদাদারা যাহা করিয়াছে এবং করিতেছে. সেই গোরক্ষণ, চাষের কাজ প্রভৃতিই যে তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, করিম ও বসির এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিল।

যখন তাহারা ছোট ছিল, তখন প্রাতঃকালে তাহাদের কোন কাজ ছিল না। একটু বেলা হইলে পান্তা ভাত ও যাহা কিছু তরকারি থাকিত তাহাই আহার করিয়া গরুর পাল লইয়া তাহারা মাঠে যাইত। তাহার পর আড়াই প্রহর বেলায় বাড়ীতে আসিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া আবার মাঠে যাইত ; অপরাহ্নকালে গরুর পাল লইয়া বাড়ী আসিত। তাহার পর তাহাদের ছুটী। তখন কোন দিন বা করিম বসিরদ্দির বাড়ী আসিত, কোন দিন বা বসিরদ্দি করিমদিগের বাড়ী গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেলা করিত ; কোন দিন বা পাড়ায় বেড়াইতে যাইত।

যখন তাহারা বড় হইল, তখন বাপ চাচার সঙ্গে তাহাদিগকেও চাষের কাজ করিতে হইত। সে সময় দিনমানে অনেক সময় করিমের সহিত বসিরদ্দির সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ হইত না। তাহাদের জমি ভিন্ন ভিন্ন মাঠে ছিল, সারাদিন সেইখানে কাজ কর্ম্ম করিতে হইত। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া দুই বন্ধুতে মিলিত হইত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা গল্প প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত হইত। এমনও অনেক দিন হইত যে, একজন আর একজনের বাড়ীতেই রাত্রি কাটাইয়া দিত। তাহাদের

পিতামাতার ইহাতে কোনও আপত্তি ছিল না; বরং এই দুইটী যুবকের এমন প্রগাঢ় মিত্রতা দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইত।

[২]

বসিরদ্দি পিতার একমাত্র সন্তান, সুতরাং সে পিতামাতার নয়নের মণিস্বরূপ ছিল। এনাতুল্লা যেখানে যাহা ভাল জিনিস দেখিত, ছেলের জন্য আনিত। বসিরদ্দিও পিতা মাতার আজ্ঞাবহ ছিল। করিমের আরও তিনটী ছোট ভাই এবং দুইটী ভগিনী ছিল; তাহাদের সংসারও বৃহৎ। জমির যাহা আয় হইত তাহা দ্বারা তাহাদের সংসারখরচ কোন রকমে চলিয়া যাইত।

এক বৎসর খুব সুজন্মা হইল। কৃষকেরা বলিল, গত পনর বৎসরের মধ্যে এমন ফসল হয় নাই। সে বৎসর ধান বিক্রয় করিয়া এনাতুল্লা দুই পয়সা ঘরে আনিল। তখন তাহা[illegible] [illegible]রিয়া বসিল যে, এইবার ছেলের বিবাহ দিতে হইবে। [illegible]র এখন নাবালক নহে, তাহার বয়স সতর বৎসর হইয়াছে। শরীরের কথা বলা যায় না, কখন কি হয়। একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য এনাতুল্লার পত্নী স্বামীকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এনাতুল্লা পত্নীর এই সঙ্গত প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে পারিল না। অনেক অনুসন্ধানের পর প্রায় বার-ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামের এক গৃহস্থের বয়স্থা সুন্দরী কন্যার সহিত এনাতুল্লা পুত্রের বিবাহ স্থির করিল।

এক মাত্র পুত্র বলিয়া এনাতুল্লা এই বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিল। ধান বিক্রয় করিয়া সে যে দেড়শত টাকা পাইয়াছিল,

তাহাতে ব্যয় সংকুলান হইল না। গ্রামের মহাজন রামমোহন পোদ্দারের নিকট হইতে মাসিক শতকরা দুই টাকা সুদে সে আরও আড়াই শত টাকা ধার করিল। এনাতুল্লা মনে করিল, এবার যেমন ধান হইয়াছে আর দুই বৎসর এমন ধান পাইলে সে মহাজনের ধার ত শোধ করিবেই, অধিকন্তু বাড়ীর পশ্চিমের ভিটায় একখানি বড় ঘর তুলিবে।

বসিরদ্দির বিবাহে করিমের আনন্দ দেখে কে? সে বাড়ীর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া দিনরাত বন্ধুর বাড়ীতেই থাকে; বিবাহের যাহা কিছু আয়োজন করিমই তাহার ভার গ্রহণ করিল। যে দিন বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিবার কথা, সে দিন করিমই এনাতুল্লার সঙ্গে গেল। মেয়ে দেখিয়া তাহার খুব পসন্দ হইল,—মেয়ে যেমন সুন্দরী, তেমনই বয়স্থা; চাষার ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। করিম মনে মনে তাহার মিতের অদৃষ্টের যথেষ্ট প্রশংসা করিল। হাঁ, যদি বিবাহ করিতে হয় ত এমন বউই চাই।

করিম বাড়ী আসিয়া বউয়ের রূপের কথা মিতেকে বলিল। এ তল্লাটের মধ্যে, চাষা মুসলমান দূরে থাকুক, বড় বড় হিন্দুর ঘরেও এমন পরী নাই, এ কথা করিম বসিরদ্দিকে এবং পাড়ার আর দশ-জনকে জানাইয়া দিল। সকলেই এনাতুল্লার পসন্দের তারিফ করিল।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের অনেক আত্মীয় কুটুম্বকে সে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। এনাতুল্লা মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিল; সকলেই বলিল, হাঁ বিবাহে রীতিমত ঘটা হইয়াছে। এনাতুল্লার সাতটা পাঁচটা নাই, একই ছেলে; তাহার বিবাহে এই রকম দু'পয়সা ব্যয় না করিলে কি ভাল দেখায়? এনাতুল্লা এত অর্থব্যয় সার্থক মনে করিল।

[৩]

মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আর। এনাতুল্লা মনে করিয়াছিল, আগামী বৎসরও খুব শস্য হইবে, সুতরাং ঋণ শোধ হইয়া, তাহার পশ্চিমের ভিটায় একখানি বড় ঘর উঠিবে। কিন্তু তাহার আশা স্বপ্নে পরিণত হইল। উপর্য্যুপরি দুইটি বৎসর বড়ই অজন্মা গেল। ক্ষেতে যে কিছু শস্য জন্মিল তাহাতে সংবৎসরের খোরাকি চলাই ভার হইল। শুধু এনাতুল্লার বলিয়া নহে, করিমের পিতার ক্ষেত্রেও তেমন শস্য জন্মিল না; সকলের মুখে একই কথা, "এবার কি উপায় হবে?"

বিপদের উপর বিপদ। সহসা একদিন এনাতুল্লার জ্বর হইল। সামান্য জ্বর, তার আর কি? দুই দিন উপবাস দিলেই সারিয়া যাইবে। গরিব মুসলমানেরা কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে পারে না, ডাকিবার সামর্থ্যও নাই। তাহারা জ্বরে ভোগে, উপবাস করে, পাড়ার লোকে যে যাহা বলে সেই সকল টোট্‌কা ব্যবহার করে; বাড়াবাড়ি হইলে দুই পয়সার কুইনাইন খায়। শেষে যদি পরমায়ু থাকে, তবে বাঁচিয়া উঠে, নতুবা জীবলীলা শেষ করে। এনাতুল্লার জ্বরেও সেই ব্যবস্থাই হইল। দিন দুই উপবাসের পরও যখন জ্বর গেল না, তখন প্রতিবেশী বৃদ্ধ সলিম মণ্ডল কি একটা টোট্‌কা ঔষধ দিল; তাহাতেও জ্বর গেল না, আরও বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর একদিন রাত্রিশেষে এনাতুল্লা সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

বসিরদ্দি চারিদিক অন্ধকার দেখিল। সংসারে মাতা ও যুবতী পত্নী, ঘরে অন্নাভাব; তাহার উপর মহাজনের ঋণ! সে কি

করিবে ভাবিয়া পাইল না। এই দুঃখ ও বিপদের সময় প্রতিবেশীরা সকলেই মুখে সহানুভূতি দেখাইল; কিন্তু তাহার আবাল্য মিত্র করিম এই বিপদের সময় একবারে বুক দিয়া পড়িল। তাহাদেরও অবস্থা ভাল ছিল না। তবুও এখনও তাহার পিতা বর্ত্তমান, এখনও তাহার তিনটী ভাই আছে। সে যথাসাধ্য বসিরদ্দির সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহাকে সাহস দিতে লাগিল। মাথার উপর আল্লা আছেন, তিনি তিনটী প্রাণীকে কখনই অন্নের অভাবে মরিতে দিবেন না। যেমন করিয়া হয় সংসার চলিবে। ভয় কি? বন্ধুর আশ্বাসবাক্যে বসিরদ্দি মনে বল পাইল।

যথাসময়ে দুইটা গরু বিক্রয় করিয়া বসিরদ্দি পিতৃকার্য্য শেষ করিল! মহাজন পোদ্দার মহাশয় ইহারই মধ্যে দুইদিন টাকার তাগাদা করিয়া গিয়াছেন। বসিরদ্দি তাঁহাকে বলিয়াছে, "পোদ্দার মহাশয়, টাকা মারা যাবে না; তবে একটু দেরী হবে। আমি বাপের ঋণ রাখব না, যেমন করিয়াই হউক শোধ করব।" কিন্তু কেমন করিয়া যে সে এত বড় একটী সংসার প্রতিপালন করিয়া ঋণ শোধ দিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না।

কৃষক-পল্লীতে অনেকেরই সে বৎসর অতি কষ্টে চলিল। যাহাদের কিছুই সঞ্চিত ছিল না, তাহারা দুই চারিটী গরু বেচিল, কেহ বা ঘটি, বাটী বন্ধক দিয়া কোন প্রকারে দিন চালাইল। বসিরদ্দির পাঁচটী গরু সেই বৎসরই ক্রেতার হস্তগত হইল। উপায় নাই, সপরিবারে ত আর না খাইয়া মরিতে পারে না? সকলেই ভাবিল আগামী বৎসরে অবশ্যই কিছু ফসল হইবে। কিন্তু পরের বৎসরেও অজন্মা হইল, মাঠের শস্য মাঠেই শুকাইয়া গেল। এক বিন্দু বৃষ্টিপাত হইল না। তখন চারিদিকে হাহাকার উঠিল;

কেমন করিয়া দিনপাত হইবে ভাবিয়া কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। ফতেপুরের অধিকাংশ কৃষকই মহা বিপদ গণিল। করিম ও তাহার পিতা দিনমজুরী আরম্ভ করিল। করিমের ছোট তিনটী ভাই পরের বাড়ী রাখালী করিতে গেল! বসিরদ্দি কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। করিমের দেখাদেখি সেও দিনমজুরী আরম্ভ করিল।

করিম কিন্তু এই সময়ে বসিরদ্দিকে বড়ই সাহায্য করিতে লাগিল। নিজে যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার কিছু সে প্রতিদিন বসিরদ্দিকে দিত। বসিরদ্দি প্রথম প্রথম লইতে অস্বীকার করিত; কিন্তু শুধু তাহার উপার্জ্জনে যখন দিন চলে না, তখন বন্ধুর দান সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। করিম প্রতিদিনই বসিরদ্দির বাড়ীতে কিছু না কিছু পাঠাইয়া দিত; কোন দিন বা আধ সের লবণ, কোন দিন এক সের মটর, কোন দিন বা এক পোয়া তৈল সে বসিরদ্দির বাড়ীতে দিয়া যাইত। ইহার অধিক দেওয়া তাহার শক্তিতে কুলাইত না। করিম শুধু যে এই সকল আবশ্যক দ্রব্য দিয়াই ক্ষান্ত থাকিত তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে সে দুই পয়সার বাতাসা কি দুই পয়সার গুড় কিনিয়া বসিরদ্দির স্ত্রীকে দিয়া যাইত। বসিরদ্দি নিষেধ করিলেও সে শুনিত না; বলিত "বসির ভাই, বৌয়ের যাতে কোন কষ্ট না হয় তা দেখা তোমার আমার উচিত।" বসির বলিত "ভাই, এখন কি পয়সা নষ্ট করবার সময়। আর তোমাদেরও ত অবস্থা ভাল নয়। ও দুই পয়সার জিনিষ তোমার বাড়ীতে দিও। আমার যে উপকার তুমি করছ তার কথা আমি চিরদিন মনে রাখব।"

করিম যেন ক্রমেই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। একদিন সে

একগাছি লাল ঘুন্‌সী ও একখানি ছোট চিরুনী কিনিয়া আনিল এবং বসিরের অসাক্ষাতে তাহার স্ত্রীকে দিতে গেল। বসিরের স্ত্রী প্রথমে তাহা লইতে অস্বীকার করিল, কিন্তু করিম যখন কিছুতেই ছাড়িল না তখন সে উহা লইয়া তুলিয়া রাখিল। তাহার পর যখন বসির বাড়ীতে আসিল, তখন ঐ দুই দ্রব্য বাহির করিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল।

বসিরের সহিত যখন করিমের সাক্ষাৎ হইল তখন বসির বলিল "করিম ভাই, তুমি এ সকল কি করিতেছ? তুমি যা রোজগার কর তা ত আমি জানি; তবে তুমি, এ সকল জিনিষ কেন কিনে আন? এ সকল কি ভাল? আর কখনও এমন ক'রে পয়সা নষ্ট ক'রো না।"

করিম এ কথার কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিল। কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল ততই করিমের ব্যবহার বসিরের নিকট ভাল বোধ হইল না। করিম এখন সন্ধ্যার সময় বসিরের বাটীতে আসে এবং রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করে, হাসি তামাসা করে। এ সকল বসিরের চক্ষে ভাল বোধ হয় না। কিন্তু করিম তাহার অবাল্য বন্ধু, তাহার পরম উপকারী, করিম তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারে! এই সকল কথা যখনই তাহার মনে হইত, তখন সে আর কথা বলিতে পারিত না। এদিকে প্রিয়তমা পত্নীর উপরও তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাহার স্ত্রী যে করিমকে ভাই ভিন্ন অন্য চক্ষে দেখিতে পারে, একথা তাহার মনেই আসিত না। তবুও কি জানি কেন, সময়ে সময়ে সে হৃদয়ে কেমন একটা অশান্তি বোধ করিত। মনে হইত করিমের এত ঘনিষ্ঠতা ভাল নহে। কিন্তু সে

মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে পারিত না। তবে সে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিত।

[৪]

এই সময়ে তাহারা শুনিল যে, এবার তাহাদের দেশে যদিও ধান জন্মে নাই, কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলে যথেষ্ট ধান জন্মিয়াছে এবং তাহাদের দেশের অনেকে ধান কাটিতে যাইতেছে। বাদা অঞ্চলের কৃষকেরা স্বয়ং সমস্ত ধান কাটিয়া উঠিতে পারে না। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বহুসংখ্যক শ্রমজীবি নৌকা করিয়া ঐ অঞ্চলে ধান কাটিতে যায়। তাহারা ধান কাটিয়া মজুরী স্বরূপ পয়সা পায় না, ধান পায়। করিম ও বসির পরামর্শ করিল যে, তাহারা দুইজনে ধান কাটিতে যাইবে। মাস খানেকের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া সুন্দরবনে গেলে তাহারা যে ধান পাইবে তাহাতে অবশিষ্ট কয় মাস অনায়াসে চলিবে।

এদিকে বসিরদ্দির অবস্থা দেখিয়া মহাজন রামমোহন পোদ্দার টাকার জন্য কড়া তাগাদা আরম্ভ করিল; কিন্তু বসির টাকা পাইবে কোথায়? উদরের অন্নেরই সংস্থান নাই, ঋণ শোধ করিবে কিরূপে। তখন পোদ্দার মহাশয় নালিস করিয়া ডিক্রী পাইল। বসিরদ্দি যখন সুন্দরবনে যাইবার পরা-মর্শ করিতেছিল সেই সময়ে একদিন তাহার জমি নীলাম হইয়া গেল। তাহাতেও মহাজনের ধার শোধ হইল না! বসিরদ্দি বুঝিল, বুড়া মা ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য তাহাকে অতঃপর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

সুন্দরবনে যাওয়াই স্থির হইল। করিমের বাপ তাহাতে

সম্মতি প্রদান করিল। করিমদিগের একখানি ছোট নৌকা ছিল, সেই নৌকায় চড়িয়া উভয়ে যাইবে। গ্রামের আরও দুই একটী যুবক করিম ও বসিরের সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু নৌকা ছোট বলিয়া করিম তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল। এ যাত্রা তাহারা দুই বন্ধুতেই ধান কাটিতে যাইবে, আর কাহাকেও সঙ্গে লইবে না।

বসির করিমকে বলিল, "করিম ভাই, যেমন করিয়া হ'ক প্রায় একমাস বাড়ী ছাড়া থাকতে হবে। এই একমাস আমার মা ও স্ত্রী কি খেয়ে বাঁচবে, তার ত কিছুই ব্যবস্থা করতে পারছি না। কেহ যে দু দশ টাকা ধার দিবে তাহা ত বোধ হয় না। এক উপায় আছে, আমার স্ত্রীর গায়ে যে দুই তিনখানি রূপার গহনা আছে, তাই এনে তোমাকে দিচ্ছি; তুমি কোন খানে রেখে কয়েকটা টাকা এনে দাও। তাহারই কিছু আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই; আর কিছু মায়ের হাতে দিয়ে যাই, তাই দিয়ে কোন রকমে এই একমাস সংসার চলুক।"

করিম বলিল "সে কি কথা! বৌয়ের গায়ের গহনা বন্ধক দিতে হবে কেন? সে কিছুতেই হবে না। তুমি ভেবো না; তুমি শুধু যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।"

বসির বলিল "তোমার অবস্থা ত সকলই জানি। তুমি এত টাকা কোথায় পাবে?"

করিম বলিল, "তুমি সে ভাবনা ছেড়ে দাও না। কা'ল তোমার টাকা পেলেই ত হল? তার পর তুমি যখন পার টাকা শোধ দিও।"

বসির আর কোন কথা বলিল না। করিম পরদিন কোথা হইতে দশটী টাকা আনিয়া বসিরের হাতে দিয়া বলিল, "আর দেরী করলে চলিবে না; আর আর গাঁয়ের লোকেরা চ'ল গেছে; দেরী হ'লে হয় ত আমরা কাজ পাব না।"

পরদিন আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়াই স্থির হইল। করিম এদিকে গোপনে আরও পাঁচটী টাকা বসিরের স্ত্রীকে দিতে গেল; সে বলিল, "দেখ এ টাকার কথা কাহাকেও বলিও না। যদি খরচের টাকার কম পড়ে তখন এই টাকা খরচ করিও। আমি আছি, তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না।"

বসিরের স্ত্রী এমনভাবে টাকা লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিল না। সে করিমের সহিত কথা বলিত; সে বলিল, "আমার টাকার দরকার কি! মায়ের হাতে এ টাকাও দিয়া যাও, তিনিই খরচ করবেন।"

করিম বলিল "তাঁকে দশ টাকা দিয়াছি, এ টাকা আমি তোমাকে দিলাম। তোমার যখন যা দরকার হবে এই টাকা দিয়া কিনিও। এ টাকা তুমি না নিলে আমি বড়ই রাগ করব। আর এ টাকার কথা কাহাকেও বলিও না।"

বসিরের স্ত্রী এতদিন করিমের প্রদত্ত অনেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু কোন দিনই সে সে সকল উপহার প্রসন্ন বদনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যখনই করিম যে দ্রব্য দিতে আসিয়াছে, তখনই সে প্রতিবাদ করিয়াছে; তবে পাছে তাহার স্বামী অসন্তুষ্ট হয়, এই ভাবিয়া সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই সকল উপহার গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বামী বাড়িতে আসিলেই সমস্ত কথা তাহাকে বলিয়াছে।

বসির মনে মনে এ সকল পছন্দ না করিলেও মুখ ফুটিয়া নিষেধ করে নাই। কিন্তু আজ করিম বৌকে গোপনে টাকা দিতে চায়, টাকার কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করে, ইহা বৌয়ের শুধু যে ভাল লাগিল না, তাহা নহে; তাহার মনে ঘৃণার উদয় হইল। করিম কি তাহাকে পয়সা দিয়া কিনিতে চায়? কেন সে করিমের দেওয়া টাকা লইবে? আর টাকা যদি দিতেই হয়, তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া যদি সে সাহায্য করিতেই চায়, তবে তাহার হাতে টাকা দিতে আসে কেন? সে তাহার শাশুড়ী বা স্বামীর হাতে ত টাকা দিতে পারে। সে চাষার মেয়ে বটে, সে দরিদ্র মুসলমানের স্ত্রী বটে, কিন্তু তাহার কি মান ইজ্জত নাই? সে কেন টাকা লইতে যাইবে?

ক্ষণেকের মধ্যেই সে এত কথা ভাবিয়া ফেলিল; তাহার চক্ষু হইতে যেন আগুনের কণা ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া করিম বলিল "বৌ, কথা বল্‌ছ না যে?"

বছিরের স্ত্রী তখন আহতা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিল "করিম ভাই, তুমি আমাকে কি মনে কর? তুমি আমার কে, যে তোমার টাকা আমি নেব? আমাকে টাকা দিবার তোমার দরকারই বা কি? আমি গরিবের বৌ বটে, কিন্তু তাই ব'লে তোমার টাকা আমি নিতে পারি না। টাকা দিতে হয় তোমার মিতেকে বা তাঁর মাকে দিও। নিতে হয় তাঁরা নেবেন। আমি তোমার টাকা চাইনে। তোমাকে বলে দিচ্ছি, মাথার উপর আল্লা আছেন। আজ থেকে

কোন জিনিস আমায় দিতে এস না। তোমার দেওয়া জিনিস আমার কাছে হারাম।” সে আর কথা বলিতে পারিল না, রাগে অধীর হইয়া দীপ্ত বিদ্যুৎশিখার ন্যায় ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। করিমও তাহাকে আর কিছু বলিবার অবকাশ পাইল না; শুধু সে এক দৃষ্টিতে ঘরের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ইহার একটু পরেই বসির বাটীতে আসিল। তখনই তাহাদের যাত্রা করিতে হইবে সুতরাং বসির সেই আয়োজনে ব্যস্ত হইল। তাহার স্ত্রী উল্লিখিত ঘটনার কথা স্বামীকে বলিবার সুযোগ পাইল না। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল স্বামীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলে এবং তাহাকে করিমের সহিত ধান কাটিতে যাইতে নিষেধ করে; কিন্তু সে সুযোগ সে মোটেই পাইল না। একটু পরেই করিম আসিলে তাহারা দুইজনে বসিরের মাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিল।

[৫]

তিন দিন পরে তাহাদের নৌকা কাউখালির নিকটে পৌঁছিল। সেদিন করিম একটু সকাল সকাল নৌকা লাগাইবার কথা বলিল। বসির বলিল “করিম ভাই, এখনও বেলা আছে, আর একটু এগিয়ে চল। ঐ ত কাউখালির বন্দর দেখা যাচ্ছে, আর একটু গেলেই ওখানে পৌঁছিব।

একে বিদেশ, বিভুঁই, আর এখানটায় বড়ই জঙ্গল, একখানি নৌকাও এখানে নেই। চল ভাই এখানে নৌকা বেঁধে কাজ নেই। ঐ বন্দরে অনেকগুলো নৌকাও দেখা যাচ্ছে। রাত্রিকালে এই জঙ্গলের পাশে না থেকে আর একটু যাওয়াই ভাল।”

করিম বলিল, “বসির ভাই, দেখছ না জোয়ারের টান! এ ঠেলে যাওয়া বড়ই কষ্ট হবে। কেন, এ স্থানটা মন্দ কি? এখানেই থাকি, শেষরাত্রের ভাটায় নৌকা ছেড়ে দেব। এই ভাটাতেই আমরা তিন নম্বর ঘাটে পৌছিতে পারব। ঐ ত বন্দর, এখানে ভয়ই বা এমন কি?”

করিমের কথায় বসির আর আপত্তি করিল না, দুই জনে খালের মাঝখানে নৌকা বাঁধিল। সুন্দরবন অঞ্চলে রাত্রিকালে তীরে নৌকা বাঁধিতে নাই, বড় বাঘের ভয়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঘেরা সাঁতরাইয়া নদীর মধ্যস্থিত নৌকা হইতেও মানুষ লইয়া যায়।

নৌকা বাঁধা হইলে বসির বলিল, “করিম ভাই, এ রাত্রিতে আর ভাত রেঁধে কায নেই, নৌকার উপর আগুন জ্বাললেই বাঘই হোক্ আর মানুষই হোক্ জান্‌তে পারবে যে, এখানে একখানি নৌকা আছে। তাতে বিপদও হোতে পারে। ও বেলার যে কয়টা ভাত আছে তাই দুজনে খাই, আর কাল যে চিড়ে কিনেছিলাম, তারও কিছু আছে, তাতেই আজ রাত কাটান যাক্।

করিম তাহাতেই সম্মত হইল। হাত মুখ ধুইতেই সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল। তখন দুই বন্ধুতে তামাক খাইতে খাইতে

গল্প আরম্ভ করিল। বসির বলিল, "করিম ভাই, আজ আমার প্রাণটা যেন কেমন কর্‌ছে, এ কয়দিন বাড়ীর কথা মনে হোয়েছে, কিন্তু আজকার মত নয়। আজ সারাদিন থেকে থেকে শুধু বাড়ীর কথাই মনে হচ্চে, বুকের ভেতর কেমন কোরছে; মনে হচ্চে আর বুঝি বাড়ী যেতে পার্‌ব না, আর হয় ত মাকে দেখ্‌তে পাব না। প্রাণটা যেন থেকে থেকে কেমন হয়ে যাচ্ছে!"

বসিরের কথা শুনিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে করিমের শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে কি ভাবিল বলিতে পারি না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল "বসির ভাই, বাড়ী ছেড়ে আস্‌লে প্রথম প্রথম সকলেরই অমন হয়। তুমি কোন দিন বাড়ী ছাড়া হও নাই, বাড়ীতে যাওয়ার জন্য মন অমন কোরতেই পারে। তা কি কোরবে ভাই, যদি বাড়ীতে থাক্‌লে দিনপাত হোত, তা হলে কি আর এই বিদেশে জঙ্গলের মধ্যে আসি। কিছু ভেবো না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাস কেটে যাবে; তার পরই বাড়ী যাব।"

বসির কোন কথা বলিল না, কিন্তু কি জানি কেন, থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল; তাহার মনে হইতে লাগিল, আর বুঝি সে বাড়ী যাইতে পাইবে না, আজই যেন তার জীবনের শেষ দিন। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল।

বসিরকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া করিম বলিল, "বসির ভাই, চুপ কোরে রইলে যে। রাত হলো, আমিই ভাত বেড়ে দিই। এস, আজ সকালে সকালেই দুইজনে ঘুমাই, আবার শেষ রাত্রিতেই উঠ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া করিম ভাত বাড়িতে লাগিল। দুই প্রহরের ভাত ও কুমড়ার তরকারি ছিল। করিম তাহাই দুইটা মাটীর পাত্রে বিভক্ত করিল। তাহার পর সে একবার চকিত দৃষ্টিতে বসিরের দিকে চাহিল। বসির তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন নদীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একমনে বাড়ীর কথাই ভাবিতেছিল। করিম অতি সতর্কভাবে নৌকার পার্শ্বে একটা স্থানে হাত দিল, অতি সাবধানে ছোট একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিল। সেই মোড়কের মধ্যে গুঁড়ার মত কি একটু ছিল, তাহার সমস্তটাই একভাগ তরকারীর সহিত মিশাইয়া দিল এবং সেই ভাগটা বসিরের ভাতের উপর দিয়া বলিল, "বসির ভাই ভাত খাও, তুমি আজ অমন হোলে কেন?"

বসির সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যমনস্কভাবে তাহার মৃৎপাত্রখানি কোলের কাছে টানিয়া লইল। দুই তিন গ্রাস ভাত খাইয়াই বসির বলিল, "করিম ভাই, তরকারীটা এমন কেন? আমার যে গলার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল, আমার যে"—আর তাহার কথা সরিল না। সে নৌকার উপর শুইয়া পড়িল।

করিম বলিল, "বসির ভাই, ও কি? তুমি শুয়ে পড়লে কেন?" বসির আর কোন কথা বলিতে পারিল না; গলার মধ্য হইতে গোঁ গোঁ শব্দ উঠিতে লাগিল, এবং সে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। করিম নির্ব্বাক হইয়া তাহার আবাল্য বন্ধুর মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল; সে একবার বসিরের হাতখানিও ধরিল না, একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না; মূর্ত্তিমান সয়তান তখন তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল। বসির আর অধিকক্ষণ হাত পা নাড়িতে পারিল না। পাপিষ্ঠ করিম তরকারীর সহিত বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল;

তাহার ক্রিয়া হইতে বিলম্ব হইল না। বসির ক্রমশঃ নিশ্চল অসাড় হইয়া পড়িল। করিমও সেই ভাবেই বসিয়া আছে, তাহারও সাড়া শব্দ নাই।

একটু পরেই তাহারও বোধ হয় জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন সে বসিরের দেহ একবার নাড়িয়া দেখিল, জীবনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন সে ধীরে ধীরে বসিরের দেহ তুলিয়া ধরিল এবং সবেগে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ঝুপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর সমস্ত নীরব। স্রোতের জল পূর্ব্ববৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

করিম তখন জোয়ারের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিল, তাহার ধান কাটা শেষ হইয়াছে!

[৬]

যে জন্য ধান কাটিতে যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, বসিরদ্দি যদি তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সে সাবধান হইত। বাড়ীতে থাকিবার সময়, করিম তাহার স্ত্রীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিত, তাহাতে বসিরের মনে অন্যবিধ আশঙ্কার উদয় হইত। কিন্তু করিম যে এতদূর অগ্রসর হইবে, সে কথা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। করিম তাহার শৈশবের সাথী, যৌবনের বন্ধু ও সখা; সহোদরাধিক স্নেহের পাত্র। সে যে বিপদে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিয়াছে। এমন বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রতি ঈদৃশ সন্দেহ!

শৈশবসহচর বসিরকে জলে ভাসাইয়া দিয়া করিমের মনে কি

ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে করিম সেই যে নৌকা ছাড়িয়াছে, পথে আর সে কোথাও নৌকা বাঁধে নাই। নৌকায় যে সামান্য চিড়া ও গুড় ছিল, দুই দিন তাহাই সে খাইল। এ দুই দিন সে স্নান পর্য্যন্তও করিল না। তৃতীয় দিনে যখন সে বাড়ীর ঘাটে পৌছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, বন্ধুর মৃত্যুশোকে সেও যেন মৃতপ্রায় হইয়াছে। তাহার মলিন মুখ, অনাহারে শীর্ণ শরীর, তাহার গভীর শোকের সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

করিম বাড়ীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ধীরে ধীরে তীরে উঠিল; নৌকায় যে সামান্য জিনিসপত্র ছিল তাহা তীরে নামাইবার কোন চেষ্টাই সে করিল না, জিনিষগুলি নৌকার মধ্যেই পড়িয়া রহিল। সে তীরে উঠিয়া প্রথমে বসিরের বাড়ীর দিকে চলিল। পথে যে দুই চারি জন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইল, তাহারা করিমের অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; করিম তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তরই দিল না; সে এমন ভাব দেখাইল যেন তাহাদের প্রশ্ন তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। তাহারাও করিমের ভাব দেখিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না।

বেলা তখন নয়টা। বসিরের স্ত্রী গৃহকার্য্য শেষ করিয়া স্নানে যাইবার আয়োজন করিতেছে। সেই সময় করিম বসিরের বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং "হা আল্লা, কি করিলে" বলিয়া, উঠানের উপর পড়িয়া গেল। বসিরের স্ত্রী দাবায় বসিয়া তেল মাখিতেছিল; সে সহসা করিমকে তদবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বসিরের বৃদ্ধা মাতা ঘরের মধ্যে ছিল। সে বৌয়ের চীৎকার শুনিয়া "কি হলো কি হলো"

বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখে, বসিরের স্ত্রী ভয়ে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছে; উঠানে করিমের চেতনাশূন্য দেহ বিলুণ্ঠিত হইতেছে।

বৃদ্ধা তখন বারান্দা হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি করিমের নিকটে গিয়া দেখিল করিমের সংজ্ঞা নাই। "বৌ, শীগ্‌গির জল আন" বলিয়া বৃদ্ধা করিমের মস্তক কোলে তুলিয়া বসিল এবং নিজের অঞ্চলদ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। বসিরের স্ত্রী জল আনিয়া করিমের মুখে মাথায় দিতে লাগিল।

একটু পরেই করিমের কৃত্রিম মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল; সে চাহিয়া দেখে বসিরের মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে, এবং বসিরের স্ত্রী নিকটেই দাঁড়াইয়া। করিমের জ্ঞান-সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া বসিরের মাতা বলিল, "করিম, কি হয়েছে বাপ? আমার বসির কৈ? সে ভাল আছে ত?"

করিম সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, "হা আল্লা কি করিলে!" বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন বসিরের নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বসিরের স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কান্নার শব্দ শুনিয়া প্রতিবে- পুরুষ স্ত্রী বালক বালিকা সকলেই দৌড়িয়া আসিল। প্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই মুখে এক কথা, "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?" কিন্তু কে উত্তর দিবে? করিম তখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে।

তিন চারিজন পুরুষ তখন ধরাধরি করিয়া করিমকে

বারান্দায় তুলিল, এবং তাহার জ্ঞানসঞ্চারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া করিমের মাতা, ভগিনী ও ভাইয়েরাও উপস্থিত হইল; করিমের পিতা মাঠে গিয়াছিল, সে একথা জানিতে পারিল না।

করিমের মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না। যে ভাণ করে, তাহাকে জাগাইয়া তোলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অনেক জল ঢালিয়া, বহুক্ষণ বাতাস করিয়া অবশেষে সকলে করিমকে প্রকৃতিস্থ করিল। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বসির ভাই আজ তিন দিন হইল ওলাউঠায় মারা গিয়াছে। আমি কত চেষ্টা করিলাম, কত যত্ন করিলাম, কিছুতেই কিছু হইল না। আর সেখানে সেই জঙ্গলের মধ্যে 'দাওয়াই' কোথায় পাইব। বসির ভাইকে কোলে করিয়া কেবল আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরই বসির ভাই মারা গেল! হায় হায়, আমি তার কিছুই করিতে পারিলাম না!" করিম আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল!

তখন চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বসিরের মাতার করুণ ক্রন্দনে কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। করিম মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা বসিরের মাতাকে সান্ত্বনা দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। বসিরই পরিবারের একমাত্র অবলম্বন; সেই অবলম্বনশূন্য হইয়া বসিরের মাতা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

বসিরের স্ত্রী এতক্ষণ নীরবে ক্রন্দন করিতেছিল। ক্রমে তাহার ক্রন্দনের বেগ কমিয়া গেল। সে এক দৃষ্টিতে করিমের

দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে কি প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব? একটু পরেই দেখা গেল বসিরের স্ত্রী উঠান হইতে উঠিয়া ঘরের বারান্দায় যাইয়া বসিল; তাহার বদনমণ্ডলে কেমন একটা দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিরের মায়ের নিকট গেল। বসিরের মা তখন বৌকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু বসিরের স্ত্রীর চক্ষু তখন শুষ্ক। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

প্রতিবেশী পুরুষেরা করিমকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল; রমণীদিগের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত আর সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। সে দিন আর বসিরের বাড়ী উনান জ্বলিল না। প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে একজন অনেক বুঝাইয়া বসিরের মাতাকে স্নান করাইল। বসিরের স্ত্রী স্নান পর্য্যন্তও করিল না। দুইটি স্ত্রীলোক সারাদিন উপবাসেই কাটাইল।

সন্ধ্যার সময় করিম বন্ধুর বাড়ীতে আসিল এবং বসিরের মায়ের নিকট বসিয়া তাহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিল। বসিরের মাতা করিমকে বসিরের রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "দুই প্রহরে বসির ভাই ভাত ও কুমড়ার তরকারী নিজেই রাঁধিয়াছিল। আমরা দুই জনেই ভাত খাইলাম। খাওয়ার পরেই বসিরের একবার দাস্ত হইল। আমি মনে করিলাম ও কিছুই নয়। তখন নৌকা

ছাড়িয়া দিলাম। একটু পরেই আবার নৌকা লাগাইতে হইল; বসিরের আবার দাস্ত হইল। এবার সে কাতর হইয়া পড়িল, আমারও মনে ভয় হইল। নৌকা লাগাইয়াই থাকিলাম। তাহার পর দুই তিনবার দাস্ত হইলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমি আর কি করিব? চারিদিকে জঙ্গল, নদীর মধ্যেও অন্য নৌকা দেখিতে পাইলাম না। বসিয়া বসিয়া আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালে বসির ভাই মারা গেল। তখন আর কি করি, সমস্ত রাত্রি তাহাকে লইয়া নৌকাতেই রহিলাম। রাত্রিতে বাঘের ভয়ে উপরে উঠিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে ডাঙ্গায় উঠিয়া একটা ছোট কবর কাটিলাম এবং অতি কষ্টে বসির ভাইকে মাটী দিলাম। তাহার পর আর ধান কাটিতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। বাড়ী আসিবার জন্য নৌকা ছাড়িলাম। এ তিন দিন আমি কিছু খাই নাই; দিন রাত নৌকা চালাইয়া বাড়ী আসিয়াছি। আগে যদি জানিতাম যে এমন হইবে, তাহা হইলে কি আর ধান কাটিতে যাই। হা আল্লা, কি করিলে।" করিম আবার কাঁদিতে লাগিল।

তখন বসিরের মা বলিল, "করিম, এখন আমাদের উপায়?" করিম নয়ন মার্জ্জনা করিয়া বলিল, "সে জন্য ভাবি না, আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি, ততদিন তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। আমিও ত তোমারই ছেলে। বসির গিয়াছে, আমি আছি। তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি যেমন করিয়া হোক্ তোমাদের সংসার চালাইব। তাহার জন্য ভাবিও না।"

করিমের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যেন অকূল সাগরে কূল পাইল। সে করিমকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

[৭]

করিম বাড়ী চলিয়া গেলে বসিরের স্ত্রী তাহার শাশুড়ীর নিকট আসিয়া বসিল ; সে ঘরের মধ্য হইতে এতক্ষণ করিমের সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল।

বসিরের স্ত্রী তাহার শাশুড়ীকে বলিল "মা, করিম ভাই তোমাকে কি বল্‌ছিল।"

বুড়ী বলিল "আমার বসির কেমন করিয়া মারা গিয়াছে সেই কথা বল্‌ছিল। আহা! বাছার আমার শরীর একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। বসিরকে ও আপনার ভাইয়ের মত ভালবাস্‌ত! হা আল্লা! এ কি হলো? এ কি করিলে?"

বৌ বলিল "তার পর আর কি কথা হলো?"

বুড়ী বলিল "তার পর ঘর গৃহস্থালীর কথা হল। আমার বসির ত চ'লে গেল ; এখন উপায়? দুটো দানা ত পেটে দিতে হবে। আমার ত মরণ নেই।"

বৌ বলিল "সে সম্বন্ধে করিম কি বলিল?"

বুড়ী বলিল "করিম যে আমার বসিরের মত, আমার পেটের ছেলের মত। সে কি আমাদের ফেল্‌তে পারে! তাই সে বল্‌ছিল যে, সেই এখন আমাদের ভার নেবে। যে ক'রে হোক দুটো মানুষের দুটো দানা দেবে।"

বৌ। আর কি কোন পথ নেই মা?

বুড়ী। আর কি উপায় আছে মা? এক ভিক্ষা——তাই কি এখন অদৃষ্টে আছে।

বৌ। পরের হাততোলা খাওয়ার চেয়ে ভিক্ষা কি ভাল নয়?

বুড়ী। না মা, সে কি হয়? আর আজকালকার দিনে কে কারে ভিক্ষা দেয়, আর তাতেই কি চলে?

বৌ তখন বলিল "দেখ মা, আমার কথা শোন। তুমি করিমের কাছে থেকে কিছু নিতে পারবে না। তার দেওয়া ভাত আমি খাব না, তোমাকেও খেতে দেব না। আমি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে ক'রে যা পাবো তাই খাবো; ভিক্ষে না জোটে না খেয়ে ঘরে প'ড়ে মরব, তবুও করিমের দেওয়া ভাত খাব না।"

বৌয়ের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কিছুক্ষণ বৌয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার বলিল "বৌ, তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই বুঝতে পারছ না! রাত পোহালেই যে আধ সের চা'লের দরকার হয়। তারপর আর মাস দুই গেলেই আর একটি জীব আস্‌বে; তখন কি হবে মা? একটা হিল্লে ত চাই। আর করিম আমার ছেলের মত; আমরা দুটা ভাতের জন্য ভিক্ষা করব, তা কি সে দেখ্‌তে পারে? তাই সে বলছিল যে; যেমন ক'রে হ'ক্ আমাদের দুটো দানাপানির যো ক'রে দেবে। এখনকার দিনে কে কাকে এমন কথা বলে মা?"

বৌ বলিল "তুমি যা-ই বল না কেন, করিমের কাছে থেকে কিছু নিতে পারবে না—কিছুতেই না। তাতে জান যায় ভাল। তারপর দুমাস পরের কথা বোল্‌ছো, তা দুমাস ত যাক্, তখন যা অদেষ্টে থাকে তাই হবে।"

বুড়ী বলিল "মা, তোমার কথা বুঝেছি। তুমি হয় ত তোমার বাপমায়ের কথা ভেবে সাহস কোরছ; দুদিন পরে তুমি তোমার বাপমায়ের কাছে চলে যাবে; যেমন ক'রে হোক্ তারা তোমায়

পুষ্‌বে; তোমাকে তারা ফেলে দিতে পারবে না। কিন্তু এ বুড়ীর কি হবে মা? বুড়ো বয়সে আমি কোথায় যাব? এ দুনিয়ায় যে আমার আর কেউ নেই। হা আল্লা, এমন যোয়ান ছেলেটাকে নিয়ে গেলে, আর এই বুড়ীকে চোখে দেখ্‌তে পেলে না!"

বৌ বলিল "মা, তুমি আমাকে কি এমনি ছোটলোকের মেয়ে ব'লে মনে কর? তোমায় ছেড়ে আমি কোথায়ও যাব না। বাপমার বাড়ী যাব কেন? তারা আমাকে যেখানে দিয়েছে আমি সেইখানেই প'ড়ে থাক্‌ব। এই পরামাণিকের ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। মরতে হয় এই ভিটেয় প'ড়ে মরব—এই যে আমার বেহেস্ত—এই যে আমার সব! দেখ মা, তুমি কিছু ভেবো না; আল্লা যখন পয়দা ক'রেছেন তখন খাওয়ারও ঠিক ক'রে দিয়েছেন। আল্লার যদি মর্‌জি হয় যে, আমরা না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ব, তা হলে হাজারটা করিমেও আমাদের খেতে দিতে পারবে না, বাদসার দৌলতও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। নসিবে যা আছে তাই হবে। তুমি ভাব্‌ছ কেন মা? আমাদের অদেষ্টে সুখ নেই, আল্লা তা লেখেন নাই। সুখই যদি অদেষ্টে থাক্‌বে, তা হ'লে এতদিন পরে তোমার ছেলে আমাদের ছেড়ে বাদাম্ব ধান কাট্‌তে যাবে কেন? আর সেখানে এমন ক'রেই বা মারা পড়্‌বে কেন?"

বুড়ী বলিল "সে কথা ত বুঝি মা, সে কথা বুঝি। তা ব'লে করিম যে এমন ক'রে বুক দিয়ে পোড়তে আস্‌ছে, তার কি? আমাদের এই বিপদের সময় আল্লাই করিমকে পাঠিয়েছেন। আর মা, করিম বড় ভাল ছেলে, এমন ছেলে কি আর হয়! আমাদের

জন্যে সে জান দিতে পারে। তার ভাত খাব না কেন—তাকে আর বসিরকে ত আমি দুই ভাবতাম না।”

বৌ বলিল “তা তুমি যাই বল, আমি কিছুতেই তার দেওয়া ভাত খাব না। তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি তার ভাত খাও, তুমি তার সঙ্গে কথা বল, তাকে ছেলে ব’লে আদর কর। আমি আজ থেকে বল্‌ছি, খোদার কসম্‌, আমি তার কাছ থেকে কিছু নেব না, তার দেওয়া দানা খাব না ; তার সঙ্গে কথা ব’লব না, তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখ্‌ব না। এতে এই ভিটেয় না খেয়ে মরতে হয় তাও কবুল।” এই বলিয়া বসিরের স্ত্রী সেখান হইতে উঠিয়া গেল। বুড়ী বৌয়ের কথা বুঝিতে না পারিয়া দাওয়ায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

[৮]

বুড়ী সারারাত্রি ভাবিয়া এক মতলব স্থির করিল। তাহার পুত্রবধূর কথা শুনিয়া সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, করিমের কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করা সহজ হইবে না ; হয় ত বৌ রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে। এদিকে করিমকে সে কিছুতেই অসন্তুষ্ট করিতে পারে না। বৌ যাহাই বলুক, করিমই এখন তাহাদের একমাত্র অবলম্বন! সে করিমের কোন অপরাধই দেখিতে পাইল না। করিম পূর্ব্বেও কত রকমে তাহাদের সাহায্য করিয়াছে, এখন এ বিপদের সময় কাহার ভরসায় সে করিমকে অসন্তুষ্ট করিবে? বুড়ী মনে করিল, বৌ একটু শান্ত হইলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবে। এখন দুই চারি দিন বৌয়ের সহিত প্রতারণা করায় হানি কি?

পরদিন যখন করিম আসিয়া তাহাদের কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল, তখন বুড়ী বলিল, "বাবা করিম, ঘরে যা চা'ল ডা'ল আছে তাতেই আমাদের কয়েকদিন চ'লে যাবে। আর আমার হাতেও কিছু আছে, তা দিয়েই এখন খরচ চল্‌বে। তার-পর যখন দরকার হবে তখন তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছে চাইব, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে? তুমি আমার পেটের সন্তানের মত, আমার বসিরও যা ছিল—তুমিও তাই। দেখ বাবা, যেন আমরা না খেয়ে মারা না যাই। তবে একটা কথা তোমাকে না ব'লে থাকৃতে পারছি না। তুমি মনে কিছু কোরো না। আমার বৌটার মাথার ঠিক নেই। আহা! যে শোক পেয়েছে তাতে অমন সকলেরই হয়। কা'ল বৌ বল্‌ছিল যে, তুমি কিছু দিলে সে নেবে না। তার হয় ত মনে হয়েছে যে, তোমার পরামর্শ শুনেই বসির বাদায় গেল, আর বিদেশে মারা গেল। তাতেই তোমার উপর তার কেমন একটা মনের ভাব হয়েছে। হাজারও হোক, এখনও ত বয়স হয় নাই, বুদ্ধিও পাকে নাই; তার-পর হঠাৎ এই শোকটা পেয়েছে। তা, তুমি কিছু মনে কোর না বাবা! তুমিই আমার এখন বল ভরসা, তোমার কাছে না নিলে কি ভিক্ষা করে খাব? আমি বৌকে বল্‌ব যে, আমার হাতে কিছু আছে তাই দিয়ে সংসার চলে যাবে; তুমি যে দিচ্ছ তা আর তাকে বল্‌ব না। তারপর দিন কয়েক গেলেই তার শোক অনেকটা কমে আস্‌বে, তখন সে সব কথা বুঝ্‌তে পারবে; তখন আর সে অমত ক'রতে পারবে না। বাবা, আমার এ কথায় কিছু মনে ক'রো না। তোমার কাছে ত আর কিছু লুকোবার নাই।"

করিম বুড়ীর কথা শুনিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে মনে

করিয়াছিল, বিপদে পড়িয়া বসিরের স্ত্রী নরম হইবে। পূর্ব্বের সমস্ত কথাই তখন তাহার মনে হইল। বিষণ্ণ মনে সে বলিল, "তা বেশ, তাই হবে। বৌয়ের এখন বুদ্ধির ঠিক নেই, এখন কি তার কথায় কাণ দিতে আছে। তা যাক্, আমি রোজই আস্‌ব, বৌকেও নানা রকমে শান্ত করবার চেষ্টা করব। অদৃষ্টে যদি দুঃখই না থাক্‌বে তা হ'লে কি বসির ভাই এমন ক'রে ছেড়ে যায়।" এই বলিয়া করিম কাঁদিতে লাগিল।

করিমের কাতরতা ও চক্ষুর জল দেখিয়া বুড়ীর প্রাণ গলিয়া গেল। সে বলিল "বাবা, সবই অদৃষ্টের ফল। এখন তুমিই আমাদের বল ভরসা। বৌয়ের কথায় কিছু মনে ক'রো না; ছেলে মানুষ, না বুঝ্‌তে পেরে যা হয় একটা ভেবে ব'সে আছে।"

করিম বলিল "না, তাতে কি আমি দুঃখ করছি। যখন যা দরকার হবে তুমি আমাকে বোলো, আমি তা এনে দিয়ে যাব। আর বৌকে তুমি যা বল্‌তে হয় বোলো।" এই বলিয়া করিম চলিয়া গেল।

বসিরের স্ত্রী তখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিল। করিমের সহিত তাহার শাশুড়ীর কি কথা হইল তাহা সে শুনিতে পাইল না। করিম চলিয়া যাইবার পর বৌ যখন বুড়ীর নিকট আসিল, তখন বুড়ী বলিল "বৌমা, করিম এসেছিল। তাকে আমি ব'লে দিয়েছি যে, তার কাছে আমরা কিছু চাইনে, যেমন ক'রে হোক আমাদের দিন কেটে যাবে। কথাটা শুনে সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আহা! করিম ছেলেটা বড় ভাল। তার কান্না দেখে আমার বড় দুঃখ হোলো; আমার বসিরকে সে আপনার ভাইয়ের মত ভাল বাস্‌ত।

আমার কথা শুনে সে বল্‌ল যে, যদি কখন কিছুর অভাব হয় তা হ'লে যেন তাকে জানাই। আর যখন যা কিনে কেটে আন্‌তে হবে, পয়সা তাকে দিলে সে এনে দিয়ে যাবে। আমরা ত হাটে বাজারে যেতে পারব না। এতদিনও ত যাই নাই, এখন কি অদেষ্টে আছে আল্লাই জানেন। সে আরও বল্‌ল যে, সে রোজই এসে আমাদের তত্ত্বতালাস ক'রে যাবে।"

বসিরের স্ত্রী বলিল "তাকে এ বাড়ীতে আস্‌তে নিষেধ করলেই ভাল করতে মা!"

বুড়ী বলিল "না বাছা, সে কি বলা যায়। তার ত কোন অপরাধই দেখি না। এই ত গাঁয়ে কত লোক রয়েছে, কৈ আর কেউ ত ডেকে জিজ্ঞাসা করতেও এলো না। তুমি বৌমা, একটু স্থির শান্ত হোলেই বুঝতে পারবে যে, ও আমাদের কত ভাল বাসে, ওর ধার কি কখন শোধ হবে!"

বছিরের স্ত্রী দেখিল যে, করিমের উপর তাহার শাশুড়ীর অগাধ বিশ্বাস। সে তখন চুপ করিয়া রহিল। সে মনে মনে স্থির করিল, করিম যদি ইহার পর কোন দিন তাহার সহিত ঘনিষ্টতা করিতে আসে, কোন দিন কোন প্রকারে অন্য ভাব প্রকাশ করে, তবে সেই দিন হয় তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে, আর না হয় সে নিজে তাহার শ্বশুরের ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া যাইবে।

বসিরের স্ত্রী তখন ঘরের মধ্যে যাইয়া তাহার রূপার পৈছে বাহির করিয়া আনিল এবং শাশুড়ীর হাতে সেই পৈঁছা দিয়া বলিল "মা, এই গহনাখানি বেচে যা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে এখন আমাদের চলুক, তারপর যা হয় হবে।"

বুড়ী বলিল "না মা, এখন ও গহনা বেচবার দরকার নেই।

এতদিন কাউকেও বলি নাই, আজ তোমাকে বল্‌ছি। আমার হাতে কিছু টাকা আছে ; বিপদ আপদে দরকার হতে পারে ব'লে এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলেম। এখন সেই টাকাই খরচ কোরব ; তাতেই কিছুদিন চলে যাবে। সে জন্য তুমি কিছু ভেব না। যে কয়দিন চলে চলুক, তারপর আল্লার মনে যা থাকে তাই হবে। তুমি গহনাখানা তুলে রাখ গে।" বলা বাহুল্য বৌকে প্রতারিত করিবার জন্য বুড়ী এই মিথ্যা কথাটা বলিল। আমরা বেশ জানি তাহার হাতে তখন তেরগণ্ডা পয়সা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বৌ শাশুড়ীর কথায় বিশ্বাস করিল। সে মনে করিল, এতকালের বুড়ীর হাতে দুদশ টাকা থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাই সে বলিল, "তা এখন তোমার টাকাতেই চলুক, তার পর যখন তোমার হাতের টাকা ফুরিয়ে যাবে তখন গহনা বেচলেই হবে।"

[৯]

দেখিতে দেখিতে চারি মাস চলিয়া গেল। বসিরের স্ত্রী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল। এখন করিম প্রতিদিনই দুইবার তিনবার বসিরের বাড়ীতে আসে ; আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া দিয়া যায় ; দুইমাসের ছেলেটীকে আদর করে ; অকারণে বিলম্ব করে ; বসিরের মাতার সহিত বৃথা কথাবার্ত্তায় সময় কাটায় ; কিন্তু সাহস করিয়া বসিরের স্ত্রীকে কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু এমন ভাবেই বা কত দিন চলে ? যে রমণীকে লাভ করিবার জন্য সে নরহত্যা, বন্ধুহত্যার পাপে লিপ্ত হইতেও দ্বিধা বোধ করে নাই, সেই রমণী, সেই সুন্দরী যুবতী, তাহার সম্মুখেই ঘুরিয়া বেড়ায়,

অথচ তাহার সহিত কথাটী পর্য্যন্ত বলে না, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। ইহা নিতান্তই অসহ্য! এমন করিয়া সে আর কত কাল কষ্ট সহ্য করিবে? তাহার সহিষ্ণুতা, আত্মসংযমশক্তি সীমা অতিক্রম করিতেছে। সে আর তাহার মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না! বসিরের বিধবা পত্নীকে লাভ করিতেই হইবে। সহজে যদি সে তাহাকে নিকা করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইবে না। তাহার প্রতিজ্ঞা, এই সুন্দরী যুবতীকে লাভ করিতেই হইবে—জান কবুল!

এতদিন করিমের বিশ্বাস ছিল এই পল্লীবাসিনী সরলস্বভাবা সুন্দরী কখনই তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। কেন সে করিমকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে? বসির অপেক্ষা সে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তাহার রূপ আছে, দেহে শক্তি আছে, যৌবন আছে, সে একেবারে পথের ভিখারীও নহে। এখনও তাহার বাড়ীতে তিন খানি লাঙ্গল আছে, এখনও তাহার গোশালায় গাই বলদে দশ বারটা মজুদ। কিসে সে এই সুন্দরীর অযোগ্য? সে যে কালে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, গ্রামের মণ্ডল হইবে না, এ কথাই বা অসম্ভব কেন? সে মনে করিয়াছিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার খাতিরেও বসিরের স্ত্রী তাহাকে নিকা করিতে সম্মত হইবে। কিন্তু এখন সে দেখিতে পাইল যে, বসিরের স্ত্রীর রকম ভাল নহে। তাহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া দূরে থাকুক সে করিমকে ঘৃণা করে; কাজেই করিম এই অকৃতজ্ঞা যুবতীর অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিশোধ দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। সে অবশেষে স্থির করিল যে, বসিরের বৃদ্ধা মাতার নিকট

সে প্রথমে নিকার প্রস্তাব উপস্থিত করিবে ; তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া সে সরলভাবে বসিরের স্ত্রীকে তাহার অভিপ্রায় জানাইবে। বসিরের স্ত্রী যদি তাহাতে সম্মত হয়, ভাল ; আর যদি এই নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকটা নিজের মঙ্গল না বুঝিয়া, তাহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে, বলপ্রকাশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এই স্থির করিয়া একদিন সন্ধ্যার পর সে বসিরেব মাতার নিকট বসিয়া, প্রথমে নানা গল্প করিতে লাগিল। দেশের অবস্থা, ধান চা'লের দুর্ম্মূল্যতার কথা, খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতার কথা আলোচনা করিতে লাগিল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে অতি বিনীতভাবে বলিল, "আজ কয়েক দিন হইতেই একটা কথা বলব মনে করছি। এ কয় দিন আর বলা হয় নাই।" এই বলিয়াই করিম চুপ করিল ; কেমন করিয়া সে আসল প্রস্তাবটা উপস্থিত করিবে, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া বসিরের মাতা বলিল, "কি কথা বাবা করিম! বলিতে বলিতে চুপ কোরে গেলে কেন?"

করিম বলিল, "তা—তা—এমন কিছু নয়। বল্‌ছিলাম কি—আমি বলছিলাম যে বসির ভাই—ত চ'লে গেল। তারপর এই ছেলেটী হ'ল। আমি আর কতকাল লুকাইয়া লুকাইয়া সাহায্য করব? তারপর এই বাড়ীতে সব সময় যাই আসি ব'লে নানা জনে নানা কথা বলে। সে ত আর ভাল নয়। তাই আমি বল্‌ছিলাম কি—তাই কথাটা এই কি না—" সহসা করিম আবার চুপ করিল। বসিরের মা সেকালের মানুষ, সে করিমের কথাটা বুঝিতেই পারিল না। সে বলিল "তা বাবা! তুমি কি মনে কোরেছ, তা আমি ত বুঝ্‌তে পারলাম না।"

করিম তখন বলিল, "আমি বল্‌ছিলাম কি, এই যে নানা জনে নানা কথা বলে, সেটা ত আর ভাল নয়; তাই আমি বল্‌ছিলাম কি—আমি বউকে নিকা করি না কেন? তা হোলে আর কোন কথাই থাক্‌বে না।"

বসিরের মা অকূলে কূল পাইল; সে মনে করিল ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর হইতে পারে না। করিম যদি বসিরের স্ত্রীকে নিকা করে, তাহা হইলে করিম কি আর বুড়ীকে ফেলিয়া দিতে পারিবে? কিন্তু বউ যদি এ কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ছেলেটাকে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যায় এবং সেখানে আর কাহাকেও নিকা করে, তাহা হইলে তাহার দশা কি হইবে? সুতরাং বসিরের মা করিমের এই প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইল। সে বলিল "বাবা করিম, তুমি বেশ কথা বলেছ। তোমার মতই কথা বটে। তা আমি বউকে আজই এ কথা ব'লে রাজি কোরব। এ ত ভাল কথা—খুব ভাল কথা।"

বৃদ্ধার সহিত করিমের যে কথা হইতেছিল, বসিরের স্ত্রী দ্বারের আড়াল হইতে তাহা শুনিতেছিল। এতক্ষণ সে কোন শব্দ করে নাই। বসিরের মা যখন বলিল, "এ ত ভাল কথা," তখন আর তাহার সহ্য হইল না। সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া সক্রোধে বলিল "কি ভাল কথা মা? আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমি অনেক দিন থেকেই কথাটা বুঝেছিলাম। তোমরা আমাকে কি মনে করেছ? এক দানা ভাতের জন্য কি আমি ঐ কুকুর-টাকে নিকা কোরব? তা কখনই হবে না। আমি তোমাদের বোল্‌ছি, আমাকে সে মেয়ে মনে কোর না। আমি এ জন্মে আর কাউকে স্বামী বোলব না! দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কোরে

খেতে হয়,—না খেয়ে মরে যেতে হয় তাও স্বীকার, তবু আমি আর নিকা 'পুষবো' না—কিছুতেই না। আমার স্বামী ম'রেছে, তাতে কি? আমি এখনও তারই স্ত্রী,—যতদিন বাঁচব তারই স্ত্রী থাকব। কা'ল থেকে আমি এ বাড়ীর—ঐ কুকুর যে বাড়ীতে আসে যায়, সে বাড়ীর দানাপানি পেটে দেব না। আমি ভিক্ষা কোরে খাব।" যুবতীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, ক্রোধে ক্ষোভে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বুড়ী ত এতটুকু হইয়া গেল। সে যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

করিম রাগে ফুলিতেছিল, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অনেক চেষ্টায় রাগ কিঞ্চিৎ দমন করিয়া সে বলিল "বেশ কথা, তাই হোক্। কাল থেকে আর তোমাদের জন্য আমি কিছু কোরব না। কি—ছোট মুখে বড় কথা? এত বড় সাহস তোমার; আমার খেয়ে, আমাকেই অপমান করা! দেখব তুমি কেমন মেয়ে। তোমার সর্ব্বনাশ যদি করতে না পারি, তবে আমি পুরুষ বাচ্চাই নই—মুসলমান নই।" এই বলিয়া করিম ক্রোধভরে চলিয়া গেল।

বুড়ীও বউয়ের উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে একটী কথাও না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল, ধীরে ধীরে আপনার বিছানায় শয়ন করিল। বউ দেখিল, শাশুড়ী তাহার উপর রাগ করিয়াছে। এখন আর তাহার রাগ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। আজ থাকুক, কাল তাহার রাগ পড়িবে। করিম যে তাহাকে ভয় দেখাইয়া গেল, তাহা সে কাণেও তুলিল না। সে জানিত উপরে একজন আছেন, তিনি দিন-দুনিয়ার মালিক; তিনি নিরাশ্রয়কে রক্ষা করেন। সে তাঁহার কৃপা কি পাইবে না?

তাঁহার কৃপাবলে, একটা কেন, দশটা করিমও তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। বসিরের স্ত্রী সেই অখিল-স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিল। তাহার পর প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ছেলেটীকে বুকের মধ্যে করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। সহসা পরলোকগত স্বামীর প্রেমপূর্ণ মুখখানি যেন তাহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইল। সে স্বামীর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

করিম বসিরের বাড়ী হইতে রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। অনতিদূরেই একটী বটগাছ ছিল। করিম সেই শাখাবহুল বটবৃক্ষের তলায় গিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তাহার পর সেই বটগাছের তলায় শয়ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। এত রাত্রিতে গ্রামের লোকজন কেহই জাগিয়া নাই, সমগ্র পল্লী সুপ্তিমগ্ন। পথে একটি লোকও চলিতেছে না। করিম সেই অন্ধকার রাত্রিতে সেই নির্জ্জন গাছতলায় শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহার ভাবনার যেন অন্ত নাই।

অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া করিম উঠিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়াই আবার ভাবিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। করিম তখন চোরের মত পা টিপিয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বাহিরের উঠানের পার্শ্বেই তাহাদের গোশালা। করিম অন্তঃপুরে না গিয়া গোশালার দিকে গেল। অতি সন্তর্পণে গোশালার চালে কি খুঁজিতে লাগিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে একখানি দা পাইল। অপরাহ্নকালে সে ঐ দাখানি গোশালার চালে রাখিয়া

গিয়াছিল। করিম দাথানি লইয়া বসিরের বাড়ীর দিকে চলিল। বসিরের ঘরের বারান্দায় উঠিয়া সে দ্বারে আঘাত করিল। বসিরের স্ত্রী তখন ঘোর নিদ্রায় মগ্ন, দ্বারে আঘাতের শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বুড়ী কিন্তু এতক্ষণও জাগিয়া ছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে করিমের সহিত তাহাদের যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, সেই ভাবনায় বুড়ীর নিদ্রা আসে নাই।

দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়াই বুড়ী বলিল, "কে গো? এত রাত্রিতে দুয়ার ঠেলে কে?"

করিম উত্তর করিল, "আমি করিম। দরজা খোল, দরকার আছে।" করিমের স্বর গম্ভীর, দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

বুড়ী তখন তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। বসিরের স্ত্রী তখনও ঘুমাইতেছে। বুড়ী বৌকে ডাকার প্রয়োজন বোধ করিল না।

করিম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বুড়ীকে বলিল, "খবরদার, যেখানে আছ ঐখানে বোসো। ওখান থেকে এক পা যদি নড়বে বা চেঁচাবে, তা হ'লে এই দায়ে তোমার মাথা নেব।" এই বলিয়া করিম দাখানি তুলিয়া ধরিল।

করিমের চীৎকারে বসিরের স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখে সম্মুখে দা হস্তে করিম! বসিরের স্ত্রীর আর কোন কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। সে চাহিয়া দেখিল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত করিম তাহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বিপদ আসন্ন দেখিয়া বসিরের স্ত্রী দৌড়িয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। ব্যাঘ্রের মত

লম্ফ দিয়া করিম বাম হস্তে তাহার চুল চাপিয়া ধরিল। তাহার পর দা-খানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "শয়তানি! এখন তোকে তোর কোন্ বাবা রক্ষা করে? আজ তোরই একদিন, কি আমারই একদিন। বল্, আমাকে নিকা করবি কি না? আজ তোর সর্ব্বনাশ না ক'রে আমি ছাড়্ছিনে।" এই বলিয়া পাষণ্ড অসহায়া রমণীর চুল ধরিয়া টান দিল, রমণী মাটীতে পড়িতে পড়িতে ঘরের বেড়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আল্লা, তুমি কি নাই?"

করিম সদ্যনিদ্রোত্থিতা বেপথুমানা রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া নিকটে টানিয়া আনিল; বলপূর্ব্বক তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। অকস্মাৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে তাহার দৃষ্টি পড়িল। ম্লান দীপালোকে তাহার অনুভব হইল, যেন একটী দীর্ঘ ছায়ামূর্ত্তি দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান! করিমের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে পলকহীন নেত্রে সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা তাহার বোধ হইল, ছায়ামূর্ত্তির ওষ্ঠ যেন নড়িতেছে। মূর্ত্তি যেন তাহাকে ডাকিল—

"করিম!"

সেই মূহূর্ত্তে ঘরের মধ্যে যদি বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলেও করিম এত ভয় পাইত না! এ যে বসিরের কণ্ঠস্বর! এ যে সেই চিরপরিচিত অশৈশবের বিশ্বস্ত বন্ধুর ছায়ামূর্ত্তি! বসিরের আত্মা কি আজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার পাপের প্রতিফল দিতে আসিয়াছে?

পাপিষ্ঠের সর্ব্বদেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল; মুষ্টি শিথিল হইল; দক্ষিণ হস্ত হইতে দা-খানি ঝন ঝন্ শব্দে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। করিম বিহ্বল

দৃষ্টিতে আর একবার সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিল। ছায়া যেন স্থির অচঞ্চল!

আবার যেন বজ্রগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল—

"করিম!"

করিমের তখন নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল; আতঙ্কে দেহ ফুলিয়া উঠিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে তখন একটা বিকট চীৎকার করিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে বাহিরের ঘোর অন্ধকারে তাহার মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

[১০]

করিম হঠাৎ কেন চীৎকার করিয়া উঠিল এবং দা ফেলিয়া উন্মত্তের মত চলিয়া গেল তাহা বসিরের স্ত্রী ও মাতা বুঝিতে পারিল না। বুড়ী তখনও বিছানায় বসিয়া কাঁপিতেছিল।

বসিরের স্ত্রীও এই অতর্কিত আক্রমণে কেমন হইয়া গিয়াছিল। নিশ্চল প্রতিমার মত সে বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় নিদ্রিত শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল। তখন যেন তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; সে তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। এত দিন সে বসিরের জন্য কাঁদে নাই; এতদিন তাহার কাঁদিবার শক্তি ছিল না। আজ এই বিপদে তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল বাহির হইল; তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আজ যদি তাহার স্বামী বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে কি নরাধম করিম তাহাকে এমনভাব লাঞ্ছিত করিতে পারিত?

বৃদ্ধা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল; যখন দেখিল করিম আর ফিরিয়া আসিল না, তখন তাহার আতঙ্ক কিঞ্চিৎ দূর হইল; সে ধীরে ধীরে ডাকিল "বৌ-মা!"

বসিরের স্ত্রী শাশুড়ীর ডাক শুনিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। বুড়ী বলিল "বৌ-মা! কি হবে?"

বৌ বলিল "আর কি হবে! অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। আজ যে আল্লা মান ইজ্জত বাঁচিয়েছেন তিনিই বাঁচাবেন। তিনি ছাড়া আমাদের আর কে আছে?"

বুড়ী বলিল "তা ত হোল, করিম যদি আবার আসে?"

বৌ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল "আবার যদি আসে তা হ'লে এবার আমি তাকে আচ্ছা সাজা দিয়ে বিদেয় কোরব। মা! এখন দেখ্‌লে তোমার করিম কেমন মানুষ। আমি অনেকদিন থেকে ওকে চিন্‌তে পেরেছিলাম; তাই তোমাকে কতদিন কত কথা বলেছি; কিন্তু তুমি ত তা শোন নাই। আজ দেখ্‌লে ত?"

বুড়ী বলিল "তা দেখ্‌লাম। কিন্তু তাও বলি মা! তুমি তাকে যেমন গালাগালি করেছিলে তাতে সে বেটাছেলে তার রাগ হতেই পারে। আর সেই রাগের মাথায় সে এ কাজ করতে এসেছিল। নইলে এতদিন তাকে দেখ্‌চি, কৈ কোন দিন ত—তার উঁচু নজর দেখি নাই।"

বৌ তীব্রস্বরে বলিল "তুমি না দেখ্‌তে পার, আমি তারে বেশ জান্‌তাম। যাক্ সে কথা। এখন আমার কথা শোন; এখন থেকে আর ওর নামও আর তুমি কোর না।"

বুড়ী বলিল "দেখ মা! ও যে রকম রেগে এসেছিল, তাতে ও

যে আমাদের অন্নে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না। হয় ত কোন্ দিন ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতেও পারে।”

বৌ বলিল “মরণ ত আছেই, তা না হয় ওর হাতেই মরব। তা ব’লে এ ভিটে ছেড়ে যেতে পারব না। দেখি, ও আমার কি ক’রতে পারে। মাথার উপর আল্লা আছেন। যিনি আজ মান ইজ্জত বাঁচিয়েছেন, তিনিই বাঁচাবেন! তুমি কিছু ভেবো না মা!”

বুড়ী বলিল “আমি বলি কি, তুমি ছেলেটা নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী যাও, আমিও এখান থেকে চ’লে যাই। লক্ষ্মীপুরে আমার এক মামুর ছেলেরা আছে, তাদের কাছে যাই। আমার দুঃখ দেখ্‌লে তারা আমাকে ফেল্‌তে পারবে না। এখানে থাকা আর উচিত নয়। তুমি যদি দুঃখে কষ্টে ছেলেটাকে মানুষ কোরতে পার, তা হ’লে আমার বসিরের নামটা থাকে।” বুড়ী আর কথা বলিতে পারিল না; ছেলের কথা মনে পড়ায় তাহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল।

বৌ বলিল “আমি এ ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না মা! আমি আল্লার নাম ক’রে ছেলেটা নিয়ে এখানেই পড়ে থাক্‌ব। ভিক্ষা ক’রে খাব, তবুও এ ভিটে ছাড়্‌ব না।”

বুড়ী বলিল “মা! তুমি ছেলেমানুষ, বুঝতে পারছ না। তোমার সোমত্ত বয়েস; কোলে ঐ দুধের বাছা; সব দিক ভেবে দেখ্‌তে হয়। যদি বাপের বাড়ী যেতে না চাও, নাই গেলে; এখানেই কারো আশ্রয় নিয়ে থাক।”

বৌ বলিল “মা, তুমি আমার মনের কথা কি আজও বুঝ্‌তে পার্‌লে না? তোমার ছেলে যে পথে গিয়েছে আমার দুনিয়ার সুখও জন্মের মত সেই পথে গিয়েছে। তুমি কি মনে কর আমি

আবার নিকে ক'রব? তা কোন দিনই হবে না। এখন এই ছেলেটাই আমার সব। আমি পরের দুয়ার ঝাঁট দিয়েও এখানে থেকে ওকে মানুষ কোরব। সবই নসিবের ফল মা, সবই নসিবের ফল! নসিবে যা আছে তাই হবে। তুমি আমি কি তা উল্‌টে দিতে পারব? তবে আর ভাব্‌ছ কেন? আল্লা আমাদের ভরসা, তিনি যা ক'রবেন তাই হবে—আমরা শুধু শুধু ভেবে কি ক'রব?"

বুড়ী এ কথার কোন জবাব খুজিয়া পাইল না। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "বুড়ো মানুষ মা, অতশত বুঝি না; যা ভাল হয় তাই কর। হা আল্লা, কি ক'রলে?"

বৌ বলিল "আল্লার নাম কর মা, আল্লার নামই কর। তিনিই সব মুস্কিল আসান ক'রবেন।"

তখন রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার তখনও গাছপালায় জড়াইয়া জড়াইয়া রহিয়াছে। সেই সময়ে গ্রামের জিতু পাগ্‌লা রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে গাহিয়া উঠিল—

ও মন পাগ্‌লা রে, হরদমে আল্লাজির নাম নিও।
ওরে দমে দমে নিও নাম, কামাই নাহি দিও।
ওরে, সকল দুখ্‌কু চ'লে যাবে মন ঠিক রাখিও।"

সেই নীরব নিঃশব্দ জনহীন পল্লীপথে হঠাৎ জিতু পাগলার এই গান বসিরের স্ত্রীর নিকটে যেন দৈববাণী বলিয়া বোধ হইল। সে তখন সেই দুই মাসের শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—

"ওরে সকল দুখ্‌কু চ'লে যাবে, মন ঠিক রাখিও।"

[১১]

বসিরের মা আশঙ্কা করিতেছিল যে, করিম হয় ত তাহাদের সর্ব্বনাশের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিবে ; হয় ত সে আর একদিন বৌয়ের উপর অত্যাচার করিবে ; তাহাও যদি না হয়, তবে হয় ত সে ঘরে আগুন দিয়া তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সেই রাত্রির ঘটনার পর হইতে করিম আর সে করিম রহিল না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার রাত্রিতে উদ্ভ্রান্ত করিম যখন বসিরের বাড়ী হইতে পলায়ন করিল, তখন তাহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না। অনুসৃত পলায়নপর জীবের ন্যায় সে সমস্ত রাত্রি কেবল মাঠে ঘাটে দৌড়িয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার অনুক্ষণ মনে হইতেছিল কে যেন তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছে, এখনই তাহার অশরীরী বাহু যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিবে। করিম মুহূর্ত্ত কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিল না। পলাও পলাও করিম! পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পলায়ন কর!

সমস্ত গাছের তলায় অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে! করিম সে দিকে চাহিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কে যেন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের অন্তরালে লুকাইয়া আছে, এখনই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে! করিম ফিরিল, বৃক্ষলতাশূন্য প্রান্তরের মধ্যে ছুটিয়া চলিল। সম্মুখে ও কি? বনের রেখা দেখা যাই-তেছে! সহসা বায়ু-হিল্লোলে গাছপালা সর্ সর্ করিয়া উঠিল, করিম চমকিয়া উঠিল! কে যেন কথা কহিতেছে! ও! কি ভীষণ শব্দ! করিম দ্রুতবেগে বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিল।

সমস্ত রাত্রি এই ভাবে কাটাইয়া অতি প্রত্যুষে সে উন্মত্তের ন্যায় বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখনও ঊষার তপনের স্বর্ণরেখা দিকচক্রবালে দেখা দেয় নাই, কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, গ্রামের লোক কেহ জাগিয়া উঠে নাই। করিম গৃহে ফিরিয়া বাড়ীর বাহিরের ঘরের দাওয়ায় পড়িয়া রহিল। শ্রান্তিভরে দেহ অবসন্ন, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রা আসিল না! সে সেই দাবার উপর পড়িয়া ক্রমাগত গড়াইতে লাগিল, কখনও বা চকিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

প্রাতঃকালে করিমের পিতা বাহিরে আসিয়া দেখে করিম বসিয়া আছে। তাহার মস্তকের কেশ রুক্ষ,নয়নে অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখমণ্ডল বিবর্ণ! পুত্রের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে তখন ডাকিল "করিম!"

করিম চমকিয়া উঠিল। বজ্রধ্বনিবৎ যেন সে শব্দ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল। আবার করিম এক লম্ফে উঠানে নামিল, তাহার পর বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল "করিম" এবং পরক্ষণেই বাড়ী ছাড়িয়া মাঠের দিকে দ্রুতবেগে দৌড়াইল।

করিমের এই অবস্থা দেখিয়া তাহার পিতা অত্যন্ত ভীত হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গিয়া আর সকলকে ডাকিয়া তুলিল। তখন চারিদিকে করিমের সন্ধানে লোক ছুটিল। কিছু-ক্ষণ পরে শুনিতে পাওয়া গেল, করিম গ্রামের পশ্চিমদিকের একটা মাঠের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সংবাদ পাইয়া করিমের পিতা এবং তাহার পাড়ার আর কয়েকজন তথায় চলিয়া গেল। তখন সকলে মিলিয়া করিমকে স্কন্ধে করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিল। তখনও সে অচেতন। জ্ঞানসঞ্চারের জন্য তাহার

মাথায় মুখে জল ঢালা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিরা বলিলেন যে, ছেলের উপর পরীর দৃষ্টি হইয়াছে। ভাল ওস্তাদ ব্যতীত আর কেহ করিমকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে না। করিমের পিতা তখন ওস্তাদ আনিবার জন্য ছুটিল। তাহাদের গ্রাম হইতে তিনক্রোশ দূরে রহমতগঞ্জে একজন ওস্তাদ ছিল। পাঁচটাকা কবুল করিয়া করিমের পিতা তাহাকে লইয়া আসিল। ওস্তাদ রোগীকে দেখিয়া বলিল "খুব শক্ত পরীতে ইহার নাগাল পাইয়াছে। জবর দাওয়াই না হইলে এ পরী ছাড়িবে না।" এই বলিয়া সেই ওস্তাদ একঘটি জল লইয়া অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই ঘটির জলে ফুঁ দিতে লাগিল। প্রায় দশমিনিট মন্ত্র পাঠ ও ফুঁ দিবার পর সেই জল করিমের মাথায় ঢালিয়া দিতে লাগিল। জল ঢালিবার অব্যবহিত পরেই করিমের জ্ঞানসঞ্চার হইল। সে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল; তাহার পরেই চক্ষু মেলিল, কিন্তু সে দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য।

ওস্তাদের কেরামত দেখিয়া সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ওস্তাদ তখন গম্ভীর স্বরে বলিল "কেমন শক্ত পরী তুমি, আজ তার বোঝাপড়া কর্‌ছি। আমার নাম মনিরদ্দী গুণীন্। তোমার মত কত পরীকে আমি সাত ঘাটের পাণি খাইয়েছি। আজ তোমারই একদিন আর আমারই একদিন।" এই বলিয়া ওস্তাদজি করিমের দুই হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাইল। করিম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; কোন্ কথাই বলিল না! ওস্তাদ তখন আবার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিল এবং মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "এখনই যা বল্‌ছি" "এখনও গেলি না" "দাঁড়া ত তোর নাক কেটে দিচ্চি।"

কিন্তু এত হুকুম, এত ভয় দেখান, কিছুতেই করিমের স্কন্ধারূঢ়া পরী একটি কথাও বলিল না, বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার কোনই আয়োজন করিল না। করিম যে ভাবে বসিয়া ছিল তেমনই থাকিল, সে হাতখানি পর্য্যন্ত নাড়িল না।

প্রায় দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত ওস্তাদজি কত মন্ত্র পাঠ করিল, কত জল ঢালিল, কত হলুদ পোড়াইয়া করিমের নাকের কাছে ধরিল, কত সরিষা মন্ত্রপূত করিয়া করিমের শরীরের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কিন্তু পরীও নামে না, করিমও প্রকৃতিস্থ হয় না।

ওস্তাদ তখন বড়ই চিন্তায় পড়িল। অবশেষে সে বলিল "বাস্ রে, আমি মনে করেছিলাম একটা পরীতে নাগাল নিয়েছে। এখন দেখছি তা নয়, দুই দুইটা পরী এ ছেলের উপর ভর করেছে। শক্ত পরীটাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। এখন যেটা আছে সে 'ধন্দ পরী'। এ ত শীঘ্র নাম্‌বে না; অনেক দিন এ ভর করে থাক্‌বে। তা থাকুক। আমি খানিকটা জলপড়া দিয়ে যাব, তাই রোজ একবার ক'রে খেতে দিও। এ পরী কোন গোলমাল ক'র্‌বে না, কিছু মন্দও ক'র্‌তে পারবে না। রোগী শুধু ধন্দ হোয়ে বসে থাকবে। কারো সঙ্গে কথা বলবে না, কোন রকম অত্যাচারও করবে না। তোমাদের কোন ভয় নেই; আমার জলপড়া খেতে খেতেই পরীটা নেমে যাবে।"

ওস্তাদ সেই দিনই বিদায় হইয়া চলিয়া গেল। করিম সত্য সত্যই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; নড়েও না, কাহারও সঙ্গে কথাও বলে না। কেহ স্নান করাইয়া দিলে স্নান করে, কেহ

খাওয়াইয়া দিলে খায়, নতুবা বসিয়াই থাকে। তবে সে থাকিয়া থাকিয়া এক একবার চমকিয়া উঠে, আর বলে "করিম !'

তখন সকলেই বুঝিল যে, এ ধন্দ পরী করিমকে শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে না। এমন যোয়ান ছেলেটা একেবারে কাজের বাহির হইয়া গেল দেখিয়া সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইল। কেন যে এমন হইল তাহা কেহই জানিতে পারিল না; বসিরের বাড়ীতে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা সে বাড়ীর কেহই প্রকাশ করিল না।

[১২]

বসিরের স্ত্রীর যে সামান্য দুইচারিখানি রূপার অলঙ্কার ছিল একে একে তাহা বিক্রয় করিয়া কয়েকমাস তাহাদের সংসার চলিল। কিন্তু সে কয়টি টাকা যখন ফুরাইয়া গেল তখন কি করিয়া সংসার চলিবে এই ভাবনাই প্রবল হইল।

বসিরের মাতা ক্রমাগত বৌকে গঞ্জনা দিতে আরম্ভ করিল। বুড়ী বড় আশা করিয়াছিল যে, করিম বসিরের স্ত্রীকে নিকা করিয়া তাহাদের সংসারের ভার গ্রহণ করিবে; তাহা হইলে তাহাদের আর অন্নচিন্তা থাকিবে না; এক প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইবে। কিন্তু বৌয়ের বুদ্ধির দোষেই তাহাদের এই দুরবস্থা হইল। বুড়ী যখন তখনই এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বসিরের স্ত্রী প্রথম প্রথম এ কথার কোন উত্তর দিত না। কিন্তু শেষে যখন তাহার অসহ্য হইল তখন সে একদিন বলিল, "মা আমারই দোষে এই কষ্ট হইতেছে।

আমি যদি তোমার কথামত কাজ করতাম, তাহা হইলে আজ দুইটা দানার জন্য ভাবতে হত না। সে যাহা হবার হয়ে গিয়েছে; তুমি আর আমার সঙ্গে থেকে কষ্ট পাও কেন? আল্লা আমার অদেষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে, তুমি তোমার মামুর ছেলে-দের ওখানে যাও। তারা তোমাকে ফেলতে পারবে না।"

বুড়ী বলিল "আমার পথ ত দেখিয়ে দিলে; তোমার কি হবে? তুমি তোমার ছেলেটা নিয়ে বাপের বাড়ী যাও, তার পর আমি যা হয় কোরব। তোমার বাপ ভাইয়ের অবস্থা ভাল; তারা দুই তিন বার তোমাকে নিতেও এসেছিল। তুমি আমারই জন্য যেতে পার নাই। এখন তাদের খবর দিই। তারা এসে তোমা-দের নিয়ে যাক্।"

বৌ বলিল "বাপের বাড়ী যদি যেতে হত তা হলে আমি কোন্ দিন যেতাম। ছেলেটার মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই ইচ্ছেই করে; কিন্তু এ ভিঁটে ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না—আমি যেতে পারবো না। কে যেন আমাকে বলে এ ভিঁটে ছাড়িস্ নে।"

বুড়ী বলিল "আরে আবাগীর বেটি! এখানে থেকে খাবি কি? শেষে কি একটা কলঙ্ক কিনবি। তোর কথা আমি শুনছি না। আমি তোর বাপ ভাইকে খবর দিচ্ছি, তারা এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাক্।"

বৌ বলিল "তুমি যাই বল মা, আমি এখান থেকে এক পাও নড়ব না। আমি এই গাঁয়ের কারো বাড়ী ধান ভেনে খাব, না হয় কারো বাড়ী উঠান ঝাড় দেব, চাকরাণীর কাজ কোরব, তবু আমি ত ভিঁটে ছাড়ব না। আল্লার যদি এমন মরজি হয়

যে, এই ছেলেটা নিয়ে আমি না খেয়ে মরব, তা হলে তাই হোক্। তোমার যেখানে যেতে হয় যাও, আমি কোথাও যাব না।"

বুড়ী এই কথা শুনিয়া বৌকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল; বৌ নীরবে সকল কথা সহ্য করিল। শেষে বুড়ী বলিল "তোর নসিবে আল্লা অনেক দুঃখ লিখেচে, তা আমি কি কোরব। তোর ছেলেটা যদি না থাকৃত তা হলে আমি এত কথা বলতাম না। একে ফেলে আমি কোথায় যাব? তা যাক, এখন দুবেলা দুটো দানার কি হবে বল্ ত? তুই কি মনে ঠিক করেছিস।"

বৌ বলিল "ও পাড়ার আমীর মণ্ডলের বৌ বলছিল যে, আমি যদি তাদের বাড়ী রান্না করি তা হলে তারা আমায় দুটো খেতে দেয়, ছেলেটারও একটু দুধ দিতে পারে। আমি তাকে বল্লাম যে আমার শাশুড়ীর কি হবে? তাতে সে বললে যে এতগুলো মানুষকে খেতে দিতে তারা পারবে না। আমি তাতে বললাম যে তাকে খেতে দিতে হবে না, আমাকে যে ভাত দেবে তাই বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমরা শাশুড়ী-বৌয়ে চালিয়ে নেব। সে তাতে স্বীকার হয়েছে। তারপর তাদের বাড়ী ত সারাদিন রান্না করতে হবে না, দুবেলা রেঁধে দিয়ে এলেই হবে। আমরা বাড়ী বসে দড়ি কাটব, ধান ভানব, মটর কলাই ভাঙ্গব, তাতেও ত কিছু হবে। এমন করে কি চলবে না? তারপর আল্লার দোয়ায় যদি ছেলেটারে মানুষ করতে পারি তখন মা, আর দুঃখু থাক্‌বে না।"

বৌয়ের কথা শুনিয়া বুড়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "হা আল্লা, অদেষ্টে এত কষ্টও ছিল; আরও বা কি আছে!"

বসিরের স্ত্রী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই করিল। সে পরের দিন

হইতেই আমীর মণ্ডলের বাড়ীতে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। মণ্ডল-বাড়ীর সকলের আহার হইয়া গেলে সে এক শানকী ভাত তরকারী লইয়া বাড়ী আসিত এবং তাহা বুড়ীকে খাইতে দিত; নিজে দিনের বেলায় উপবাসী থাকিত। বুড়ী তাহার আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত "আমি সেখান থেকেই খেয়ে দেয়ে তারপর তোমার ভাত নিয়ে আসি। আমাকে তারা যে ভাত দেয় তার কিছু আমি সেখানে খাই, আর এ কয়টা ভাত তোমারই জন্য নিয়ে আসি।" বুড়ী বৌয়ের কথাই বিশ্বাস করিত। বুড়ী বৌকে বলিয়া দিয়াছিল যে রাত্রিতে আর তাহার জন্য ভাত আনিবার দরকার নাই; সে রাত্রিতে আহার করিবে না। সুতরাং রাত্রিতে যে ভাত পাইত, বৌ তাহাই খাইত। এই ভাবেই চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল।

[১৩]

করিম বসিরকে মৃত মনে করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া আসে, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন। করিমের প্রদত্ত বিষ পান করিয়া বসির অচেতন হইয়া পড়ে; কিন্তু করিম যখন তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তখনও তাহার মৃত্যু হয় নাই। করিম যদি বসিরকে আরও ঘণ্টা দুই নৌকায় রাখিত তাহা হইলে হয় ত বসির মরিয়া যাইত। কিন্তু করিম কালবিলম্ব করিতে সাহস পায় নাই; কি জানি হঠাৎ যদি কোন নৌকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হয় ত সে ধরা পড়িতেও পারে। সে আরও মনে করিয়াছিল যে, নদীর মধ্যে

যে প্রকার কুম্ভীরের প্রাচুর্য্য, তাহাতে বসিরের দেহ জলে পড়িবামাত্রই কুম্ভীরের উদরসাৎ হইবে, তাহার চিহ্নমাত্রও আর পৃথিবীতে থাকিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়াই বোধ হয় সে তাড়াতাড়ি বসিরের দেহ জলে ফেলিয়া দিয়াছিল এবং তখনই জোয়ারের টানে সে বাড়ীর দিকে নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার মনে অনুমাত্রও সন্দেহ হয় নাই যে, বসির বাঁচিয়া উঠিতে পারে। সত্যসত্যই যাঁহারা সুন্দরবন অঞ্চলের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা বলিবেন যে, সে অঞ্চলের জলে পড়িলে লোকের বাঁচিবার সম্ভাবনা অতি কমই থাকে।

কিন্তু কথায় বলে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?" এখানেও তাহাই হইল। বসিরকে জলে ফেলিয়া দিয়া করিম নৌকা লইয়া চলিয়া গেল; বসিরের মৃতদেহ জোয়ারের টানে করিমের নৌকার পশ্চাতেই ভাসিয়া চলিল। কিছু দূর যাইয়াই বসিরের দেহ একটা গাছে আট্‌কাইয়া গেল। এই গাছটা বক্র হইয়া নদীর মধ্যে পড়িয়া ছিল। ভাটার সময় সেখানে অতি অল্প জলই থাকিত; জোয়ারের সময় গাছের কিয়দংশ জলে ডুবিয়া যাইত। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! বসিরের দেহ সেই গাছে আট্‌কাইয়া গেল। তাহার পর নদীর স্রোতে তাহার দেহটাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যত চেষ্টা করিতে লাগিল, দেহটী ততই গাছের ডালের সহিত আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল; স্রোতে আর তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিল না।

বসির তখনও অচেতন অবস্থায় ছিল; তাহার দেহটা গাছের সহিত এমনভাবে সংলগ্ন হইয়াছিল যে, নদীর স্রোত তাহার মাথা

ডুবাইতে পারে নাই, শরীরের উপর দিয়া জল চলিয়া যাইতে লাগিল।

করিম তরকারীর সহিত যে বিষের গুঁড়া মিশাইয়া দিয়াছিল, বসির তাহার অধিকাংশ খায় নাই এবং বিষও বোধ হয় তেমন তীব্র নহে। এ দিকে বসিরের শরীরে ক্রমাগত জল লাগাতে সেই বিষের শক্তি হ্রাস পাইতে লাগিল। তাহার পর যখন জোয়ারের জল সরিয়া গেল, তখন বসিরের নিস্পন্দ দেহ সেইখানে কাদার মধ্যে পড়িয়া রহিল।

রাত্রি আটটা কি নয়টার সময় করিম বসিরকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিল ; রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তাহার চৈতন্য ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। চেতনাসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বমন আরম্ভ হইল। অতিরিক্ত লবণাক্ত জল তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল। দুই চারিবার বমনের পর বসির নয়ন উন্মীলন করিল। তখন সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার মস্তিষ্ক তখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। একটু চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া আবার সে চাহিল। ক্রমে সে বুঝিতে পারিল যে, নদীর তীরে কাদার মধ্যে সে পড়িয়া আছে ; তাহার পরিধেয় বস্ত্রের খানিকটা গাছের ডালে জড়াইয়া রহিয়াছে, আর খানিকটা তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে ; তাহার বক্ষস্থল সেই গাছের দুইটা ডালের সন্ধিস্থলে আটকাইয়া গিয়াছে। আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, পার্শ্ব দিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, অদূরে বনের মধ্যে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে। তখন তাহার সমস্ত কথা মনে হইল। কিন্তু সে নদীর তীরে, কর্দ্দমাক্ত দেহে পড়িয়া কেন ? ধীরে ধীরে অতীত স্মৃতি তাহার মানসপটে জাগিয়া উঠিল, বাড়ীর কথা মনে আসিল ;

মায়ের কথা, স্ত্রীর কথা মনে আসিল; আর তাহার প্রাণের বন্ধু, জীবনের সহচর করিমের কথা মনে আসিল। তখন বিজলি-বিকাশের ন্যায় সত্যের আলোকে অকস্মাৎ তাহার মস্তিষ্ক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বসির উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিল, গাছের বন্ধন হইতে দেহটাকে মুক্ত করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল; কিন্তু তাহার শরীর শক্তিহীন, অবশ! তাহার হাত পা নাড়িবারও শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না; সে পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। যেমন অবস্থায় ছিল, সেই ভাবেই আরও কিছুক্ষণ গেল। ক্রমশঃ তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এখনই যদি নদীর মধ্য হইতে একটা কুমীর আসিয়া তাহাকে জলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়! এখনই যদি জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা বাঘ মানুষের গন্ধ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হয়। কে তাহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে? কিন্তু সে তখন এ কথা ভাবিতে পারিল না যে, প্রাণের বন্ধুর প্রদত্ত বিষ পান করিয়াও তাহার মৃত্যু হয় নাই, এই কুম্ভীর-পরিপূর্ণ জলের মধ্যে এতক্ষণ থাকিয়াও সে সেই দুর্দ্দান্ত জীবের উদরগত হয় নাই। যে অদৃশ্য হস্ত এমন ভয়ানক বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে, সেই দয়াময়ের মঙ্গল হস্তই এখনও তাহার উপর প্রসারিত রহিয়াছে। যিনি তাহাকে এই জনশূন্য স্থানে এই ভীষণ অবস্থায় এতক্ষণ রক্ষা করিয়াছেন, যদি তাঁহার কৃপা হয় তাহা হইলে এখনও তিনিই তাহাকে রক্ষা করিবেন। সে কথা তখন তাহার মনে আসিল না। সে শুধু ভাবিতে লাগিল, এই বুঝি তাহার প্রাণ যায়, এই বুঝি মৃত্যু আসিতেছে।

এমন ভাবে সে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। সে তখন উঠিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিল। এবার তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল। সে অতি কষ্টে বৃক্ষের বাহুবন্ধন হইতে শরীরটাকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া বসিল; তাহার পর কাপড়খানি টানিতে লাগিল; কিন্তু কাপড়খানি এমন ভাবে গাছের সহিত জড়াইয়া গিয়াছিল যে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবং উলঙ্গ হইয়া তবে কাপড়ের অপর ভাগ গাছ হইতে ছাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। তখনও তাহার সে শক্তি হয় নাই; সে হাত পা নাড়িতেছে বটে, কিন্তু দাঁড়াইবার শক্তি তাহার তখনও আসে নাই। অগত্যা সে খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই কুম্ভীর বা ব্যাঘ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিকে আলোকরেখা দেখা দিল। তখন তাহার হৃদয়ে কে যেন অধিকতর বলের সঞ্চার করিয়া দিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উলঙ্গ হইয়া কাপড়ের অপরাংশ গাছের ডাল হইতে ছাড়াইয়া লইল। একবার মনে করিল, কাপড়খানিতে কাদা লাগিয়াছে, জলে ধুইয়া তবে পরিবে; কিন্তু পরক্ষণেই কুম্ভীরের কথা মনে হওয়ায় সে সেই কাদামাখা কাপড়খানিই ভাল করিয়া পরিধান করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে নদীর মধ্য হইতে উপরে উঠিতে লাগিল। উপরে উঠিয়া দেখে প্রকাণ্ড অরণ্য, শুধু ছোট ছোট কাঁটা গাছ, ঘাস, আর মধ্যে মধ্যে বড় বড় গাছ; জনপ্রাণীও সেখানে নাই। সে যে বাঘের ভয় করিয়াছিল, তাহার কোন সাড়াশব্দও সে পাইল না; শুধু বনের পাখীগুলি তখন নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতী গাইতেছে।

বসির সেইস্থানে বসিয়া পড়িল। নদীর মধ্য হইতে এইটুকু

উঠিয়াই তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। সেইস্থানে বসিয়া বসিয়া সে আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল; বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা সম্বন্ধে তাহার তখন আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। অগ্নিশলাকার ন্যায় এ চিন্তা তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করিতেছিল। সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিল। তারপর সে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ গেলে, সে মাথা তুলিয়া দেখিল গাছের মাথায় প্রাতঃকালের রৌদ্র চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও একখানি নৌকার চিহ্নও নাই। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া নদীর তীরে তীরে উত্তর মুখে যাইতে লাগিল।

[১৪]

বসির কখন এ অঞ্চলে আসে নাই, এইবার প্রথম সে বাদায় ধান কাটিতে আসিয়াছিল। ধান কাটা ত হইল, এখন সে কোথায় যায়? তাহার শরীরের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে আর এক পদও চলিতে ইচ্ছা করিতেছে না; কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া থাকিয়া সে কি করিবে? সে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। পূর্ব্ব দিন বেলা এগারটার সময় সে দুইটা ভাত মুখে দিয়াছিল, তাহার পর রাত্রিতে ভাত খাইতে বসিয়াছিল মাত্র; তাহার পরই সে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর জীবন ও মৃত্যুর ঘোরতর সংগ্রাম। শরীর দুর্ব্বল, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুধায় তাহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া ফেলিল। বসির দুই চারি পা

অতি কষ্টে যায়, আর বসিয়া পড়ে; আবার একটু পরে উঠিয়া দুই চারি পা যায়।

সূর্য্য মাথার উপর উঠিল; তবুও সে জনমানব দেখিতে পাইল না। সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে শুধু জঙ্গল, সীমাহীন অরণ্য। বামে নদী। নদীর তীর দিয়া বাঁধা রাস্তা ছিল না; লোকজন যাতায়াত করিলে জঙ্গলের মধ্যে যেমন সামান্ত পথের রেখা পড়ে, সেই রকম পথ ছিল। বসির সেই পথ ধরিয়াই চলিতে লাগিল। অবশেষে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে তাহাকে এমন অবসন্ন করিয়া ফেলিল যে, সে আর চলিতে পারিল না, পথের পার্শ্বেই একটা গাছের তলায় সে শুইয়া পড়িল। তাহার তখন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল; তাহার মনে হইতে লাগিল অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। আল্লার দয়ায় সে প্রাণের বন্ধুর প্রদত্ত বিষ খাইয়াও মরে নাই; জলের মধ্যে এত কুম্ভীর ছিল, তাহারাও তাহাকে স্পর্শ করে নাই, জঙ্গলের বাঘ ও সাপও তাহাকে ধরে নাই; কিন্তু এত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াও সে বুঝি আর প্রাণ বাঁচাইতে পারিল না। তখন তাহার ঘরের কথা মনে হইল; তাহার মায়ের কথা স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। বসির গভীর মনোকষ্টে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল; সে নিশ্চয় বুঝিল এবার আর তাহার রক্ষা নাই, এখনই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। কিন্তু ভগবান যাহার রক্ষাকর্ত্তা, তাহার প্রাণ কি বাহির হয়? বসির মনে করিতেছিল, এ জঙ্গলে তাহার বুঝি কেহ নাই; কিন্তু সকলের যিনি রক্ষাকর্ত্তা, ধনী দরিদ্রের যিনি বন্ধু, তিনি যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, এ কথা বসির বুঝিতে পারে নাই।

বসিরের যখন জ্ঞানলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই সময় একখানি নৌকা উজানে আসিতেছিল। দুইজন লোক গুণ টানিয়া নৌকাখানিকে উজান দিকে লইয়া যাইতেছিল। বসির যে পথে যাইতেছিল, তাহা এই গুণ টানিবারই পথ। লোক দুইটা যখন বসিরের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না, তৃষ্ণায় তাহার জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

লোক দুইটা বসিরকে দেখিয়া দাঁড়াইল; তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিল। হয় ত তাহাদের প্রথমে মনে হইয়াছিল একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে; কিন্তু একটু দেখিয়াই তাহারা বুঝিল লোকটা জীবিত আছে। তখন এক জন অপরের হস্তে গুণের বাশটা দিয়া বলিল "মামা, গুণটা ধর ত, দেখি মানুষটার কি হই-য়াছে?" মামা ফটিক বয়সে বড়; তাহার বিবেচনা-শক্তিও একটু বেশী। সে বলিল "নে, নে, চল্; কোথাকার কে মরে পড়ে আছে, তার আবার দেখা। চল্!" ভাগিনেয় অধর বলিল "না মামা, লোকটা মরে নেই, বেঁচে আছে; তবে মরবার বড় দেরী নেই। দেখি না কি হ'য়েছে।" এই বলিয়া অধর বসিরের পার্শ্বে বসিল। করিম তখন চক্ষু মেলিল, কিন্তু কথা বলিতে পারিল না; অতি কষ্টে হাতখানি তুলিল। অধর তখন ফটিককে বলিল, "মামা, মানুষটা বেঁচে আছে। নৌকো লাগাতে বলি।" ফটিক বড় চটিয়া গেল; সে বলিল "নৌকো লাগিয়ে কি হবে? তোর ব'সে কাজ নেই। চল্।"

এ দিকে গুণের টান থামিয়া যাওয়ায় নৌকার গতি মন্দ হইল। মাঝি মহাশয় বোধ হয় নৌকায় বসিয়া ঝিমাইতেছিল। হঠাৎ নৌকার গতি কমিয়া যাওয়ায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে তীরের

দিকে চাহিয়া বলিল "কিঁ রে, গুণ যে ছেড়ে দিলি! টান্, টান্।"

অধর তখন চীৎকার করিয়া বলিল "বড় মামা, এখানে একটা মানুষ মরার মত পড়ে আছে, এখনও মরে নি; তাই দেখ্‌ছি।"

মাঝি বলিল "নে, নে, আর মানুষ টানুষ দেখে কাজ নেই; বেলা আড়াই পহর হ'তে চোল্লো, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল্।"

নৌকার মধ্যে একজন আধবয়সী ভদ্রলোক বাক্স সম্মুখে করিয়া কতকগুলি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। মাঝির কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "রামমোহন, কি রে?"

রামমোহন বলিল "কি জানি বাবু, ঐ অধরাটা বল্‌ছে যে, একটা মানুষ মরার মত না কি পথের উপর পড়ে আছে। তাই ওরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে।"

বাবু বলিলেন "মরার মত হ'য়ে মানুষ পোড়ে আছে? নৌকা লাগাও রামমোহন! শুনি, ব্যাপারটা কি?" এই বলিয়া বাবুটী নৌকার বাহিরে আসিলেন এবং ফটিক্‌কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ফট্‌কে, কি রে?" ফটিক বলিল "বাবু, একটা মানুষ এখানে পোড়ে আছে; এখনও মরে নি।" এই সময়ের মধ্যেই নৌকা তীরসংলগ্ন হইল। বাবুটী নৌকা হইতে লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি কাদা ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন! তিনি বসিরের নিকট যাইয়া দেখিলেন সে চক্ষু চাহিয়া আছে, কিন্তু কথা বলিতে পারিতেছে না, এক একবার হাত নাড়িতেছে।

বাবুটী তখন অধরকে বলিলেন "দৌড়ে, নৌকো থেকে খাবার জল একটু নিয়ে আয় ত অধরা!"

বাবুর কথা শুনিয়া অধর নৌকার দিকে দৌড়িয়া গেল। বাবুটী

তখন বসিরের হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। একটু পরেই তিনি বলিলেন "নাড়ী বড় দুর্ব্বল, কিন্তু জ্বরের মত ত দেখ্‌ছি না।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই অধর এক ঘটি জল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, রামমোহন মাঝিও সেখানে আসিল। বাবু নিজেই ঘটি লইয়া বসিরের মুখে প্রথমে একটু জল দিলেন। জল তাহার ওষ্ঠ বহিয়া পড়িয়া গেল। বাবু তখন অধরকে বলিলেন "অধরা, ঘটিটা ধর্ ত, আমি ওর মুখ ফাঁক কোরে ধরি, তুই মুখের মধ্যে জল ঢেলে দিবি। বেশী জল দিস্‌নে, গিল্‌তে পারবে না।" এই বলিয়া তিনি বসিরের মুখ ফাঁক করিয়া ধরিলেন, অধর একটু একটু করিয়া জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। বসির জল খাইতে লাগিল। প্রায় আধ ঘটি জল খাইয়া বসির মাথা নাড়িল। বাবু বলিলেন "আর জল দিস্‌নে।"

তখন বাবু বলিলেন "অধরা, লোকটাকে তুলে বসাতে পারিস্?" ফটিক বলিল "না বাবু, কি ব্যামো হয়েছে তার ঠিক নেই, অত ছোঁয়াছুঁতে কাজ নেই।" বাবু সে কথা শুনিলেন না; তিনি লোকটাকে তুলিয়া বসাইতে বলিলেন। অধর বসিরকে তুলিয়া বসাইল।

এতক্ষণে বসিরের কথা বলিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল। সে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল "আল্লা, বাঁচালে!"

ফটিক বলিল "বাবু, মানুষটা মুসলমান।"

বাবু বলিলেন, "হোক্ মুসলমান। তোরা ওকে ধ'রে নৌকোয় নিয়ে চল্। ওকে কাছারীতে নিয়ে যাই।"

ফটিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; সে হিন্দুর ছেলে, মুসলমানকে কোলের মধ্যে করিয়া নৌকায় লইয়া যাইতে তাহার মন

চাহিতেছিল না! অধর বলিল "ধর না মামা! বড় মামা, তুমিও ধর না। তিন জনে 'হাতা-সিন' ক'রে ওকে নৌকোয় নিয়ে যাই।"

ফটিক ও রামমোহন কি করে, বাবুর দিকে একবার বিরক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহারা তিনজনে বসিরকে তুলিল। বাবু বলিলেন "দেখিস্, সাবধান, ওর যেন কষ্ট না হয়।"

তিনজনে ধরাধরি করিয়া বসিরকে নৌকায় তুলিয়া লইল। বাবুটী নৌকায় উঠিয়া একখানি কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন "অধরা, এই কাপড়খানা ওকে পরিয়ে দিয়ে ওর ময়লা কাপড় জলে ফেলে দে, আর ওর গায়ের কাদামাটি ধুইয়ে দে।" ফটিক কি রামমোহন এমন কার্য্য কিছুতেই করিত না,—নায়েব বাবু বলিলেও না। কিন্তু অধর নবীন যুবক, সে এখনও ততটা স্বার্থপর হয় নাই, এখনও পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাহার প্রাণে ব্যথা লাগে। কাজেই সে দ্বিরুক্তি না করিয়া বসিরের কাপড়ের এক অংশ জলে ভিজাইয়া লইয়া তাহার গা হাত পা মুছাইয়া দিল; তাহার পর বাবুর দেওয়া কাপড়খানি তাহাকে পরাইয়া দিতে গেল। বসির "উঁ হুঁ" বলিয়া আপত্তি জানাইল এবং ডান হাত দিয়া নিজের সেই কাদামাখা কাপড়খানি চাপিয়া ধরিল।

অধর বলিল "না, না, ও কাপড়খানা ছেড়ে ফেল্‌তে হবে। ওখানা যে কাদায় মাখা হোয়েছে।" এই বলিয়া অধর তাহাকে কাপড় পরাইতে গেল। বসির তখন গায়ে একটু বল পাইয়াছিল, সে এই কাপড়পরা ব্যাপারে নিজেও একটু সাহায্য করিল।

তখন বাবুটী বলিলেন "ও গো, কিছু খাবে? ক্ষিদে পেয়েছে?" বসির অনুচ্চস্বরে বলিল "আজ দুই দিন কিছুই খাইনে।"

বাবু বলিলেন "তোমার নাম কি?"

সে বলিল "বসির সেখ।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "বসির, তোমার কি অসুখ হোয়েছে?"

বসির বলিল "অসুখ—কৈ, না—অসুখ ত হয় নি। জলে পোড়ে গিয়েছিলাম।"

বাবু বলিলেন "আচ্ছা, এখন আর কথা বোলো না, তুমি শুয়ে থাক।" এই বলিয়া তিনি নৌকার মধ্যে গেলেন। নৌকায় এক-ঘটি কাঁচা দুগ্ধ ছিল; তিনি তাহা লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং অধরকে বলিলেন "অধরা, উননটা জ্বালতে পারিস্? তা হ'লে এই দুধটুকু জ্বাল দিয়ে ওকে খাওয়ান যায়।"

মাঝী রামমোহন দেখিল মহা বিপদ। এখন উনন জ্বাল, দুধ জ্বাল দেও, ওকে খাওয়াও। এই সব করিতে করিতেই ত বেলা তিনটে বেজে যাবে। বেচারীদের তখনও স্নান আহার হয় নাই।

রামমোহন বলিল "বাবু, দুধ আর জ্বাল দিয়ে কাজ নেই; ওকে একটু কাঁচা দুধই খেতে দিন। তাই খেয়ে শুয়ে থাক্। এদিকে বেলা যে আড়াই পহর। আর দুই বাঁক গেলেই কাছারীতে উঠ্‌তে পারবো; তখন ওকে খাওয়ালেই হবে।"

বাবু বুঝিলেন রামমোহনের কথাই ঠিক। তিনি তখন বলিলেন "তবে তাই হোক্। বসির, তুমি এই দুধটুকু খেয়ে ফেল। ওরে অধরা ফট্‌কে, যা, যা, গুণ ধরগে। খুব টেনে যাস্। রাম-মোহন, নৌকো ছেড়ে দে।"

বাবুর আদেশমত [illegible] একটু দুগ্ধ পান করিল, সবটা খাইতে পারিল না। এদিকে ফটিক ও অধর গুণ ধরিল, রামমোহন নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বাবুটীর নাম শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ। তিনি কলিকাতার চৌধুরী

বাবুদের আবাদের নায়েব। গোকুলপুরে কাছারীবাড়ী। বিপিন বাবু একটা আবাদ দেখিতে গিয়াছিলেন। এখন কাছারীতে ফিরিতেছেন। বাখিয়া যেখানে পড়িয়া ছিল, সেখান হইতে গোকুলপুরের কাছারী মাইল দুই দূরে।

জমিদারের নায়েবেরা সাধারণতঃ যে প্রকৃতির লোক হইয়া থাকে বিপিন বাবু তেমন ছিলেন না। তিনি লেখাপড়ার ধার ধারিতেন। এল, এ ফেল করিয়া বৎসরখানেক সেন্‌সাস্‌ আফিসে কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর কুড়ি টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি চৌধুরী বাড়ীর একটী ছেলের প্রাইভেট মাষ্টারী করিতেন। এই উপলক্ষেই চৌধুরী বাড়ীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া ও বিস্তাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বড় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হন। তাহার পর যখন গোকুলপুরের কাছারীর নায়েবী পদ খালি হয় তখন বিপিন বাবুকেই চৌধুরী মহাশয় ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বিপিন বাবু তিন বৎসর এই নায়েবী করিতেছেন। শীতকালে মাস দুইয়ের ছুটী পান; সেই সময় বাড়ী যান; আর বাকী বারমাস গোকুলপুরেই থাকেন। বাদার মধ্যে কাছারীবাড়ীতে পরিবার লইয়া থাকা নানা কারণে অসুবিধাজনক মনে করিয়া তিনি কখনও কাছারীতে পরিবার লইয়া বাস করেন না, একাকীই থাকেন। তাঁহার সদয় ব্যবহারে প্রজারা খুব সন্তুষ্ট। জমিদার বাবুও বিপিন বাবুর কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ খুসী। বিপিন বাবু যে দুপয়সা উপরি লইতেন না তাহা নহে; কিন্তু তিনি প্রজা বা জমিদার কাহারও সর্ব্বনাশ বা ক্ষতি করিয়া কখনও এক পয়সাও লইতেন না। এই জন্যই সকলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত।

যে নৌকায় তিনি কাছারীতে যাইতেছিলেন, সেখানি কাছারীরই নৌকা। রামমোহন, ফটিক ও অধর মাসিক বেতন পাইয়া থাকে। গোকুলপুরের নিকটেই তাহাদের কিছু জমিজমা আছে। তাহাদের বাড়ী পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলায় ছিল। বাদায় জমি পাইয়া এখন তাহারা এখানেই বাড়ী করিয়াছে। তাহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত। রামমোহন ও ফটিক দুই ভাই। রামমোহনের একটী মেয়ে আছে, ফটিক নিঃসন্তান ; তাহার সন্তান হইবার আর আশাও নাই। এক-মাত্র ভগিনী যখন বিধবা হইল, রামমোহন তখন ভগিনী ও এক-মাত্র ভাগিনেয় অধরকে বাড়ীতে আনিয়া তাহাদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিল। তাহার পর তাহারা যখন দেশত্যাগ করিয়া বাদায় চলিয়া আসে তখন ভগিনী ও ভাগিনেয়কেও সঙ্গে লইয়া আসে। তাহারা তিনজনে জমিদার সরকার হইতে বেতন পায়, নায়েব মহাশয় কি অন্য কর্ম্মচারীর যখন কোথাও যাইতে হয় তখন তাহারা মাঝিগিরি করে ; অন্য সময়ে চাষ আবাদ করে।

নায়েব বাবুর নৌকা যখন কাছারীর ঘাটে পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় আড়াইটা ; এত বেলা পর্য্যন্তও কাহারও স্নান আহার হয় নাই। নৌকা ঘাটে লাগিল বিপিনবাবু মাঝীদিগকে বলিলেন "তোরা খুব সাবধানে বসিরকে কাছারীতে নিয়ে আয়।" বসির বলিল "বাবু মশাই, আমাকে একটু ধরে নিয়ে গেলে আমি হেঁটেই যেতে পারবো।" বিপিন বাবু বলিলেন "বেশ, তা যদি পার ত ভালই। এই উপরেই কাছারীবাড়ী, বেশী দূরও যেতে হবে না।"

রামমোহন ও ফটিক নায়েব বাবুর জিনিসপত্র নামাইতে লাগিল, অধর বসিরের হাত ধরিয়া তীরে তুলিল। তাহার পর সে বলিল "বসির, তুমি আমার গায়ের উপর ভর দিয়ে চল। আর

যদি চোলতে কষ্ট হয়, তবে বল, আমি তোমাকে কাঁধের উপর ফেলে নিয়ে যাই।” বসির বলিল “না, ভাই, তার দরকার হবে না, যেতে পারব।” তখন অধরের কাঁধের উপর ভর দিয়া বসির ধীরে ধীরে কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

বিপিন বাবু কাছারীতে পৌঁছিয়াই সকলকে বলিয়াছিলেন যে, নৌকায় একটী জলেডোবা মুসলমান যুবক আছে; সে দুইদিন খায় নাই; শীঘ্র তাহাকে ভাত দিতে হইবে। বসিরকে কাছারীর বারান্দায় বসাইলে সে বলিল “ভাই, আমাকে একটু পানি দিতে পার, আমার বড় পিয়াস লেগেছে।” অধর তখন মুসলমান পেয়াদাকে জলের কথা বলিতেই সে একটা বদনায় করিয়া জল আনিয়া দিল। বসির জল খাইয়া অধরকে বলিল “ভাই, আমি এখানে একটু শুয়ে থাকি।” এই বলিয়া সে মাটীর মধ্যেই শুইয়া পড়িল। অধর তখন তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর আনিয়া সেই বারান্দায় পাতিয়া দিল এবং বসিরকে বলিল “এই মাদুরে উঠে ভাল হ’য়ে শোও।” বসির বলিল “ভাই, আমার বুকটার মধ্যে যেন কেমন করছে; আমি আর উঠতে পারছিনে।” এই বলিয়াই সে চুপ করিল। অধর তখন আর দুই তিনজনের সাহায্যে বসিরকে তুলিয়া সেই মাদুরে শোয়াইয়া দিল; সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

একটু পরেই বিপিন বাবু বাহিরে আসিয়া দেখেন বসির শুইয়া আছে। তিনি তাহাকে না ডাকিয়া চাকরকে তাহার জন্য ভাত আনিয়া দিতে বলিলেন, তখনও তাঁহার নিজের আহার হয় নাই।

চাকর একখানি কলাপাতায় করিয়া ভাত, ডাল ও মাছের ঝোল লইয়া আসিল। বিপিন বাবু তখন ডাকিলেন “বসির, ওঠ,

ভাত খাও।” তাঁহার ডাক শুনিয়া বসির একবার মাথা তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল, তাহার পরেই চক্ষু মুদ্রিত করিল, আর মাথা তুলিতে পারিল না। বিপিন বাবু আবার ডাকিলেন “ও বসির, ভাত খাও।” এবার সে আর মাথা তুলিল না, চাহিয়াও দেখিল না।

বিপিন বাবু তখন তাহার পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন, শরীর হইতে যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতেছে; নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখেন প্রবল জ্বর আসিয়াছে। তিনি তখন ভীত হইলেন, ডাকিলেন “বসির ও বসির!” বসির উত্তর দিল না, তাহার তখন চেতনা ছিল না। বিপিন বাবু পেয়াদাকে ডাকিলেন। পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন “দেখ আজম সর্দ্দার, এর খুব জ্বর হ'য়েছে, একেবারে জ্ঞান নেই। তুমি এক কাজ কর; এখনই ঘোড়া নিয়ে বাবুঘাটে যাও। সন্ধ্যার মধ্যে ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আসা চাই। ডাক্তার বাবুকে বোলো যত টাকা তিনি চান, তাই আমি দেবো; তাঁকে এখনই আস্‌তে হবে। লোকটাকে অচিকিৎসায় মরতে কিছুতেই দেবো না। যাও, এখনই যাও।”

আজম সর্দ্দার বলিল “বাবুজি, ঘোড়া ত কাছারীতে নেই, মুহুরী খাওয়া দাওয়ার পর ঘোড়া নিয়ে আমলাবেড়ে গেছেন; আজ যে আস্‌তে পারেন তা বোধ হয় না।”

এই কথা শুনিয়া বিপিন বাবু যেন একটু বিরক্ত হইলেন। তিনি তখন বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া আজম সর্দ্দার বলিল “বাবুজি, এই জ্বর হোলো; আজই ডাক্তারের দরকার কি? কা'ল সকালে জ্বরের রকমটা দেখে ডাক্তার বাবুকে খবর দিলেই হবে।”

আজম সর্দ্দার বহুদিনের লোক; এই কাছারীর স্থাপনা হইতে সে এখানে আছে; লোকটী খুব বিশ্বাসী এবং কাজ-কর্ম্মেও হুসিয়ার। তাই সে নায়েব মহাশয়কে পরামর্শ দিতে সাহস পায়; অন্য কেহ হইলে এত সাহস পাইত না।

বিপিন বাবু আজমের পরামর্শে বিরক্ত না হইয়া বলিলেন "না হে, তুমি বুঝ্‌তে পারছ না। এ জ্বর বড় সহজ নয়; আজ রাত্রিতেই যদি ওষুদ না পড়ে তা হ'লে লোকটী মারা যেতে পারে। ওকে যখন পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছি, তখন যথাসাধ্য চিকিৎসা করাতেই হবে। তার পর ওর পরমায়ু থাকে, বাঁচবে। তা ত গেল, এখন কি করা যায়?" এই বলিয়া বিপিন বাবু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অধর সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দুই মামা নায়েব মহাশয়ের জিনিসপত্র কাছারীতে তুলিয়া দিয়া বাড়ীতে যাইবার সময় অধরকে ডাকিয়াছিল। অধর তাহাতে বলিয়াছিল "তোমরা যাও, লোকটার খাওয়া হ'লে আমি যাচ্ছি।" বিপিন বাবুকে চিন্তিত দেখিয়া অধর বলিল "বাবুজি, আপনি যদি হুকুম করেন তা হ'লে আমি হেঁটেই বালুঘাটে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে পারি।"

বিপিন বাবু অধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বেলা চারটে বাজে। হেঁটে গেলে তুই কি সন্ধ্যার আগে পৌঁছিতে পারবি। সন্ধ্যার পর ডাক্তার কিছুতেই এই জঙ্গলের পথে আস্‌তে চাইবে না। আর তুই-ই বা আস্‌বি কি করে?"

অধর বলিল "তিন ক্রোশ রাস্তা আমি সন্ধ্যার আগেই যেতে পারব। সেখানে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে ঘোড়ায় পাঠিয়ে দেব।

আমি না হয় আজ বালুঘাটেই থাক্‌ব, কা'ল ভোরে ফিরে আস্‌ব।"

বিপিন বাবু অধরের কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তখনই তাঁহার মনে পড়িল যে, অধর ত এই নৌকায় এল, তার ত এখনও স্নান আহার হয় নাই। তিনি বলিলেন "অধর, তোর ত এখনও নাওয়া খাওয়া হয় নেই। তা এক কাজ কর, এখানেই তাড়াতাড়ি দুটো ভাত খেয়ে নে, তারপর বালুঘাটে যা।"

অধর বলিল "তা হ'লে দেরী হ'য়ে যাবে। আমায় গোটাদুই পয়সা দিন, আমি চিড়েমুড়কী কিনে নিয়ে খেতে খেতে চ'লে যাব।"

অধরের এমন পরোপকারের ইচ্ছা দেখিয়া বিপিন বাবু বড়ই আনন্দ বোধ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুই আনা পয়সা দিয়া দিয়া বলিলেন "দেখ্ অধর, রাত্রিতে আর আসিস্ নে, বালুঘাটেই থাকিস্, বুঝ্‌লি।" অধর "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল। বিপিন বাবু আর আহার করিতে গেলেন না; একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া বসিরের বিছানার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

[১৬]

অধর কৈবর্ত্তের ছেলে; সে লেখা পড়া জানে না; কোন দিন ভদ্রলোকের সঙ্গেও মিশে নাই। কিন্তু নিরক্ষর অধরের হৃদয় কত উচ্চ, কত মহৎ। নায়েব বাবু তাহার জলখাবারের

জন্ম দুই আনা পয়সা দিলেন; সে জলখাবার কিনিয়া খাইবার অবসর লইল না। সকালবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা দুইটা আড়াইটা পর্য্যন্ত সে নৌকার গুণ টানিয়াছে। তাহার পর কাছারীতে আসিয়া বসিরের আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আহা! লোকটা দুই দিন খায় নাই। তাহার আহার শেষ হইলেই অধর মামার বাড়ীতে যাইবে মনে করিয়াছিল। কিন্তু মামার বাড়ীতে আর যাওয়া হইল না; সে বালুঘাটে ডাক্তার আনিতে চলিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে না পৌঁছিতে পারিলে ডাক্তার রাত্রিতে আসিতে চাহিবেন না; রাত্রিতে যদি ডাক্তার আসে তাহা হইলে হয় ত বসির বাঁচিবে না। অধর সেই জন্য দুই পয়সার চিড়া কিনিবার সময়ও অপব্যয় করা কর্ত্তব্য মনে করিল না। তাহাকে তিন ক্রোশ পথ যাইতে হইবে।

অধর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। ডাকের হরকরারা যেমন দৌড়াইতে থাকে, অধর তেমনই ভাবে দৌড়াইতে লাগিল। শুধুই তাহার মনে হইতে লাগিল, যেমন করিয়া হউক ডাক্তার বাবুকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সংবাদ দিতেই হইবে। আপনার মা, বাপ, ভাইয়ের জন্য হইলেও কথা ছিল না; কিন্তু বসির তাহার কেহ নহে; তাহাকে সে চেনে না, কখন দেখেও নাই। বসির জাতিতে মুসলমান। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; অধরই তাহাকে পথের পার্শ্বে প্রথম দেখিয়াছিল; অধরই তাহাকে নৌকায় তুলিয়াছিল। আহা! লোকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে! অধর দ্রুতবেগে ছুটিল।

দেড় ঘণ্টায় তিনক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় সাড়ে

পাঁচটার সময় অধর বালুঘাটে ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে পৌঁছিল। ডাক্তার বাবু তখন বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি বিপিন বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, বিপিন বাবুর নিকট তিনি নানা কারণে কৃতজ্ঞ ছিলেন। ডাক্তার বাবু সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "অধর, আমি এখনই যাচ্ছি। তুমি আমার সহিসকে ঘোড়া প্রস্তত করিতে বল। সহিসকে আর যাইতে হইবে না, আমি একলাই যাব। কিন্তু তুমি কেমন ক'রে কাছারীতে ফিরে যাবে? বেলা ত বড় বেশী নাই। আমি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলে সন্ধ্যার মধ্যেই গোকুলপুরে পৌঁছিতে পারিব। তুমি ত যেতে পারবে না। তুমি আজ আমার এখানেই থাক, কা'ল সকালে চ'লে যেও।"

অধর সেই কথাই স্বীকার করিল। সে তাড়াতাড়ি সহিসের দ্বারা ঘোড়া সাজাইয়া আনিল। ডাক্তার বাবু প্রস্তত হইয়া ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল কাছারীতে ত বেশী ঔষধ নাই; সামান্য জ্বর, পেটের অসুখ প্রভৃতির জন্য গোটাকয়েক ঔষধ মাত্র আছে। রোগীর অবস্থার কথা তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে অন্য ঔষধের প্রয়োজন হইতে পারে। তিনি না হয় কাছারীতে গেলেন, কিন্তু ঔষধ না পাইলে তিনি কি দিয়া চিকিৎসা করিবেন? তখন তিনি অধরকে বলিলেন "অধর! আমি যেন ঘোড়ায় গেলাম, কিন্তু ঔষধের বাক্স কে লইয়া যাইবে? ঔষধ না হইলে আমার গিয়ে লাভ কি? কাছারীতে হয় ত সব ঔষধ নাও থাকতে পারে। তার উপায় কি?"

অধর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিল "বাক্স বাহির করিয়া রাখুন, আমিই বাক্স নিয়ে যাব।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন "তাই ত, তুমি এই তিন ক্রোশ পথ হেঁটে এলে, আবার এখন যাবে? তার পর একটু গেলেই ত সন্ধ্যা হয়ে আস্‌বে। পথে যে জঙ্গল, আর যে বাঘের ভয়। তাই ত কি করা যায়?"

অধর বলিল "সে জন্য ভয় নেই বাবু, আপনি চলে যান, আমি আপনার পিছেপিছেই যাচ্ছি। আমি বাঘ দেখে ডরাই নে!"

ডাক্তার বাবু তখন ঘোড়ায় চড়িয়া গোকুলপুর রওনা হইলেন। অধর একটা দোকান হইতে তিন পয়সার চিড়ে মুড়কী কিনিয়া লইল; তাহার পর ঔষধের বাক্স মাথায় করিয়া কোঁচড়ের চিড়ে মুড়কী খাইতে খাইতে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

ক্রোশখানেক যাইতে না যাইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুই পার্শ্বে জঙ্গল, মধ্য দিয়া পথ। জঙ্গলের মধ্যে একটু শব্দ হইলেই অধর থমকিয়া দাঁড়ায়; পথে জনমানবের সম্পর্ক নাই। অধরের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। পরক্ষণেই আবার তাহার হৃদয়ে সাহস আসিল। সে বলিয়া উঠিল "আরে, যায় যাবে প্রাণ, একবার বই ত দুইবার মরব না।" নিজের মুখের কথায় নিজেকে উৎসাহিত করিয়া অধর চলিতে লাগিল। ক্রমেই অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। অধর তখন ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছে না। জঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে, গাছে গাছে খদ্যোৎ মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। অধর তখন গান আরম্ভ করিয়া দিল। একাকী অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিবার সময় যখন মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, তখন অনেকেই গান করিয়া থাকে। অধরও গান ধরিল—

"তুই, ভাব্‌চিস্ কি রে মন।
ঐ দেখ্ সুমুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণবেহ্ম সনাতন।
খিদে পেলে আহার যোগান, তেষ্টা পেলে জল,
আবার বেক্ষ ভ'রে রেখে দেছেন পাকা পাকা ফল;
(ভোলা মন রে—)
আবার, বিপদ কালে ডাক্‌লে হরি, কোলে করেন নারায়ণ।"

সত্য সত্যই নারায়ণই আজ এই আঁধারে অধরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন; সত্যসত্যই তাহার সম্মুখে পূর্ণব্রহ্ম সনাতনই আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন; নতুবা এই বাদার জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাত্রিকালে যাইতে বড় বড় সর্দ্দারও কখন সাহস করে না।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় অধর কাছারীতে পৌঁছিল। ডাক্তার বাবু ঔষধের বাক্সের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন—

বিপিন বাবু অধরকে বলিলেন "অধর, তুমি এখন তবে বাড়ী যাও।" অধর বলিল "আজ আর বাড়ী যাবো না, এখেনেই থাকি।"

অধর কাছারীতেই থাকিল; সেখানেই আহারাদি করিয়া সমস্ত রাত্রি বসিরের কাছে বসিয়া রহিল। কোথাকার কে, মুসলমানের ছেলে বসির, তাহার সেবা করিবার জন্য অধর সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল।

দুই দিন গেল; জ্বরও কমে না, বসিরেরও জ্ঞান হয় না। ডাক্তার প্রতিদিনই একবার করিয়া আসিতে লাগিলেন। বিপিন-বাবুর আদেশে কাছারীর সকলেই বসিরের সেবা করিতে লাগিল। তিনদিন পরে তাহার জ্ঞান-সঞ্চার হইল, সে চক্ষু মেলিল। তখনই ডাক্তারের নিকট লোক ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন "আর ভয় নাই, লোকটা বাঁচবে।"

পাঁচ ছয় দিন পরেই বসিরের জ্বর ছাড়িয়া গেল ; কিন্তু আর এক বিপদ হইল ; তাহার স্মৃতিলোপ হইয়া গিয়াছিল। 'বসির' বলিয়া ডাকিলে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে। সে কে, তাহার বাড়ী কোথায়, তাহার কে আছে, কোন কথারই ত সে উত্তর দিতে পারে না ; জিজ্ঞাসা করিলে শুধু বলে "জানি না।" সে কিছুই জানে না ; কথা বলিতে পারে, ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা বলিতে পারে, কিন্তু তাহার ইতিহাস সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার অতীত জীবনের একটী কথাও সে কিছুতেই স্মরণ করিতে পারে না। বিপিন বাবু, অধর, কাছারীর আর আর সকলে কত রকমে তাহাকে প্রশ্ন করে ; সে ভাবিতে চেষ্টা করে ; শেষে বলিয়া উঠে "কৈ, কিছুই ত মনে পড়ে না।"

তাহার বন্ধু করিম দেশে 'ধন্দ পাগল' হইল, আর সে এই বিদেশে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইয়া নূতন মানুষ হইল। বিষের ক্রিয়া দুই বন্ধুর উপরই আরম্ভ হইয়াছিল।

[১৭]

বসির এখন কাছারীতেই থাকে। সে আর কোথায় যাইবে ? তাহার ত পূর্ব্ব কথা কিছুই মনে পড়ে না। এখন অধর তাহার পরমবন্ধু। সে কাছারীর কাজকর্ম্ম যাহা পারে তাহাই করে; বিপিন বাবু যখন যেখানে যান, তাঁহার সঙ্গে লাঠি কাঁধে করিয়া যায়। মনের আনন্দে তাহার দিন কাটিতেছে। তাহার অতীত-জীবন একেবারে মুছিয়া গিয়াছে ; মায়ের কথা, স্ত্রীর কথা, প্রাণের বন্ধু করিমের কথা, কিছুই তাহার মনে হয় না। তাহার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে।

রাত্রিতে সে প্রায়ই কাছারিতে থাকে না, অধরের মামার বাড়ীতেই সে অধরের সঙ্গে গল্প করিয়া, রামমোহনের মেয়েটী লইয়া খেলা করিয়া কাটায়। অধর একদিন বলিল "ভাই, তোর নাম যে বসির তা তোর মনে পড়ে?" বসির বলিল "কৈ না। তোমরা বসির ব'লে ডাক, তাই আমার নাম বসির।"

অধর বলিল "যে দিন তোকে নদীর ধারে পাই, সে দিন তোর নাম জিজ্ঞাসা করিলে তুই ব'লেছিলি তোর নাম বসির। তাই ত আমরা তোকে বসির ব'লে ডাকি; আর সেই জন্যই ত বুঝেছি তুই মুসলমান।"

বসির বলিল "হবে।"

অধর। ভাই, তোর কি কোন কথা মনে পড়ে না। তুই বলেছিলি, তুই জলে প'ড়ে গিয়েছিলি, তা তোর মনে পড়ে?

বসির। কৈ, না, মনে ত পড়ে না।

অধর। আচ্ছা তুই খুব ভেবে দেখ্ দেখি, তোর বাড়ী কোথায়, তোর কে আছে।

বসির। ভাব্‌ব কি, আমার যে কিছুই মনে পড়ে না। ভাববার ত কিছুই খুঁজে পাই না।

অধর। তুই ত ছোট ছেলে নয়, এত বড় হয়েছিস্; তোকে কে মানুষ কোরেচে, তুই কোথায় ছিলি, কোন কথাই তুই ভাবতে পারিস্ না?

বসির। না, আমি তোদেরই চিনি, আর কাউকে ত জানিনে, চিনিনে, আমি আগে আর কোথাও ছিলাম না। বরাবর এখানেই ত আছি।

অধর। তুই ত আজ মাস দুই এখানে আছিস্; তার আগে কোথায় ছিলি?

বসির। কি জানি ভাই; ওসব আমি বুঝতেই পারি না।

অধর। তুই যে মুসলমান, তা জানিস্!

বসির। তোরা বলিস্, তাই জানি।

অধর। তবে তুই আল্লা বলিস্ কেন?

বসির। বলি কেন তা জানিনে, মনে হয় না।

অধর। তুই খুব ভেবে দেখ্ ত, কিছু মনে হয় কি না।

বসির। আমি যে ভাবতে পারি না ভাই, ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে কেমন করে, চোখে আঁধার দেখি।

অধর। যাক্, ভেবে কাজ নেই। তুই যেমন আছিস্ তেমনি থাক্। বাবু বলেছেন তোকে এখানে ঘর কোরে দেবেন, লাঙ্গল গরু কিনে দেবেন, জমি দেবেন, তোকে বিয়ে দিয়ে দেবেন।

বসির। কেন, ও সব কেন? আমিও সব চাইনে। আমি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব; তোদের বাড়ী এসে থাক্‌ব। সেই চাই, আর কিছু চাইনে।

অধর। এমনই ক'রেই দিন কাটাবি? তোর কি কিছু ইচ্ছে করে না।

বসির। কিছুই না। বেশ, বেশ ত আছি।

এই রকমের কথা যে শুধু অধরের সঙ্গেই হইত, তাহা নহে, কাছারীর সকলেই, প্রজাদের সকলেই বসিরের সহিত এই ভাবে কত কথা বলিত; কিন্তু কেহই বসিরের পূর্ব্বস্মৃতি ফিরাইয়া আনিতে পারিল না! কাজের অভ্যাস সে ভুলিয়া যায় নাই! আল্লার নাম ভোলে নাই, কাজকর্ম্ম করিবার প্রণালী ভোলে নাই,

তাহার বুদ্ধিও অবিকৃত আছে; শুধু সে তাহার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। এ ভুল কি সুখের!

বিপিন বাবু ইতোমধ্যে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন; যাইবার সময় বসিরকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজে তাহাকে লইয়া গিয়া বড় বড় ডাক্তারদিগকে বসিরের কথা বলিয়াছিলেন; ডাক্তার মহাশয়েরাও নানাপ্রকারে তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহার লুপ্তস্মৃতি ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই। সাহেব ডাক্তারেরা বলিয়াছিলেন, কোন প্রকার চিকিৎসায় তাহার স্মৃতি ফিরিবে না। কোন বিশেষ ঘটনায় লোকটার স্মৃতিলোপ হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব পরিচিত কোন একটা বিশেষ বিষয় দেখিলে হয় ত তাহার পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিতেও পারে। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বিপিন বাবু বসিরকে লইয়া কাছারীতে ফিরিয়া গেলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন এ জীবনে আর তাহার পূর্ব্ব কথা মনে পড়িবে না।

পাঁচমাস এই ভাবেই কাটিয়া গেল। বসির খায় দায় থাকে, আমোদ আহ্লাদ করে, কোন গোল নাই। সহসা একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। ঘটনাটা একটু অসাধারণ, লোকে সহসা তাহা সম্ভবপর বসিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। কিন্তু আমরা কি করিব, যাহা ঘটিয়াছিল আমরা তাহাই বলিতে পারি, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

যে রাত্রিতে ফতেপুরে বসিরের অন্তরঙ্গ বন্ধু করিম তাহার অসহায়া স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল, সেই রাত্রিতে বসির কাছারীর বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়া ছিল। রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। আজ কোন মতেই বসিরের নিদ্রা

হইতেছে না। অন্ত দিন সে শয়ন করিবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে, আজ অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ঘুমাইতে পারিতেছে না। কিছুক্ষণ সে এপাশ ও পাশ করিতে করিতে ক্রমে তাহার তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তখন সে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিল। সে দেখিল, রজনীর অন্ধকারে একব্যক্তি একখানি দা হাতে লইয়া একখানি পর্ণ-কুটীরে প্রবেশ করিল। কুটীরে ভূমিশয্যায় একটি রমণী নিদ্রামগ্না। তাহার পার্শ্বে একটি শিশু অঘোরে ঘুমাইতেছে। লোকটীকে দেখিয়া রমণী তাড়াতাড়ি যেমন উঠিতে যাইতেছিল অমনি পাষণ্ড তাহার কেশ আকর্ষণ করিল। তাহার পর দাখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল "শয়তানি! এখন তোর কোন বাবা রক্ষা করে। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! বল্ আমাকে নিকা করবি কি না? আজ তোর সর্ব্বনাশ না ক'রে আমি যাচ্ছি না।" তন্দ্রাঘোরে দিব্যচক্ষে বসির এই ঘটনা দেখিল। অকস্মাৎ তাহার স্মৃতির কপাট যেন মুক্ত হইল; যবনিকা সরিয়া গেল; পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনা তখনই স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। সে তখন শুনিতে পাইল, তাহার অসহায়া স্ত্রী বলিতেছে, "আল্লা, তুমি কোথায়?" নিদ্রাঘোরে বসির যেন তখনই সেই দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "করিম!"

বসির স্বপ্নে মনে করিয়াছিল যে, সে গম্ভীরস্বরে কথাটা বলিয়াছিল; কিন্তু তাহা নহে, সে "করিম" এই কথাটা এমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল যে, কাছারী ঘরের মধ্যে যাহারা ছিল সকলেই তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। তখন তাহারা "কি হইয়াছে, কি হইল" বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ঐ চীৎকারের পর বসিরের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে তখন বিছানায়

বসিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না।

যাহারা তাহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "ও বসির, বসির, অমন কচ্ছিস্‌ কেন? কি হয়েছে?" বসিরের মুখে আর কথা নাই। তখন ঘরের মধ্য হইতে আলো বাহির করিয়া সকলে দেখে বসির থরথর কাঁপিতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। সকলেই তখন বলিতে লাগিল "ভয় কি, বসির, ভয় কি। তুই স্বপন দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলি। ভয় কি!" লোকের কথা শুনিয়া বসির একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে তখন চক্ষু মুদিয়া শুইয়া পড়িল; তাহার পরই অনুচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সকলেই সান্ত্বনা দিতে লাগিল, সকলেই বলিতে লাগিল "বসির, কাঁদিস্‌ কেন? তুই স্বপ্ন দেখেছিস্‌।" বসিরের কান্না আর থামে না।

বিপিন বাবু তখন অন্য ঘরে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বসির স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিছুতেই তাহার কান্না থামিতেছে না। বিপিন বাবু বসিরকে ডাকিলেন, বসির সে ডাক শুনিল না; সে আরও কাঁদিতে লাগিল। অগত্যা বিপিন বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া কাছারীর বারান্দায় আসিয়া বলিলেন "ও বসির, কি হ'য়েছে; কাঁদছিস্‌ কেন?"

বসির তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না। বিপিন বাবুর স্নেহপূর্ণ আহ্বান যেন তাহার তপ্ত হৃদয়ে শীতল জল ঢালিয়া দিল। সে তখন উঠিয়া বসিল; পরিধেয় বস্ত্রে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল।

বিপিন বাবু বলিলেন "আর শুয়ে থাকিস্ না; একটু হেঁটে বেড়িয়ে আয়। স্বপ্ন দেখে কি এত ভয় পায়!" এই বলিয়া বিপিন বাবু চলিয়া গেলেন।

অধর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী গিয়াছিল। এত রাত্রিতেও বসির তাহাদের বাড়ীতে গেল না দেখিয়া সে তাহার অনুসন্ধানে কাছারীতে আসিতেছিল। অধর বেশ গাইতে পারে। সে কাছারীর নিকট নদীর তীরে আসিয়া গান ধরিল—

"আমার এই সোণার ক্ষেতে ধান হ'ল না,
কি খাব নাই ঠিকানা।
এখন, দিবানিশি ভাব্‌ছি বসি, এবার বুঝি দিন যাবে না।
ওরে, জমিদারের লোক দেখিলে মনে হয় বড় ভাবনা;
আমার, হাতে নেইক পয়সা কড়ি, কি দিয়ে দেব খাজনা।
পাগল বলে চল্‌রে সাঙ্গাত, ঐ দেখা যায় বালাখানা;
সেথা রাজার রাজার অতিথ্‌শালা, থেতে নিতে নাইরে মানা;—
হাজার নিলেও ফুরাবে না।"

[১৮]

দূরে গান শুনিয়াই বসির বুঝিল অধর তাহার অনুসন্ধানে আসিতেছে। সে তখন বিছানা ছাড়িয়া দাঁড়াইল এবং অন্যমনস্ক ভাবে উঠানে নামিয়া গেল।

অধর আর একটু অগ্রসর হইলেই বসির দৌড়াইয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। অধর জিজ্ঞাসা করিল "কি বসির

ভাই, তুই যে আজ আমাদের বাড়ী যাস্‌নি!" বসির কোন উত্তর করিল না, তাহার তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না; তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

অধর তাহার অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বসিরকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। একটু পরেই বসির বলিল "ভাই, ঘাটে নৌকা আছে?"

অধর বলিল "আছে।"

"তবে চল, দুইজনে নৌকায় গিয়া বসি" এই বলিয়া অধরের হাত ধরিয়া বসির নদীর তীরে গেল। তাহার পর দুইজনে নীচে নামিয়া নৌকায় গিয়া বসিল।

নৌকায় বসিয়া অধর বলিল "বসির, তোর আজ কি হয়েছে?"

বসির বলিল "ভাই, আজ সব কথা মনে পড়ে গেছে।"

অধর ব্যগ্রভাবে বলিল "সব কথা মনে পড়েছে? বেশ, বেশ, বেশ কথা। আমায় সব বল্। বল্‌বি ত?"

বসির ধীরে ধীরে বলিল "ভাই অধর, তুই আর জন্মে আমার কে যেন ছিলি। তুই আমার ভাই; না না, ভাইয়ের চেয়েও বড়। তোকে সব কথা বল্‌ব ব'লেই ত নৌকায় এসে বস্‌লাম" এই বলিয়া বসির চুপ করিল।

অধর বলিল "দেখ্ ভাই, সব কথা না হয় না বল্‌লি, তোর পরিচয় পেলেই হয়, তোর কে কোথায় আছে তাই জান্‌তে পারলেই হয়। আর কোন কথা শুন্‌বার দরকার নেই।"

বসির বলিল "না, না, তা হবে না। আজ আমার সব কথা মনে পড়েছে; তোকে সব কথাই বল্‌ছি। আমার মত দুঃখী মানুষ আর নেই ভাই!"

তখন বসির তাহার জীবনের সমস্ত কথা একে একে অধরকে বলিল, একটী কথাও বাদ দিল না। অধর সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল "তার পর।"

বসির বলিল "তারপর এখন কি কোরব, তাই ভাব্ছি। বাড়ীতে তাদের যে কি অবস্থা হয়েছে, তারা বেঁচে আছে কি ম'রে গিয়েছে, কে জানে? করিমের মনে আরও কি আছে তাই বা কি ক'রে বল্ব।"

অধর বলিল "বসির ভাই, তোমার স্ত্রীর উপর কি সন্দেহ হয়?" বসির বলিল "কিছুতেই না, কোন মতেই না।"

অধর বলিল "আমারও সেই বিশ্বাস। হায় রে সংসার! হায় রে বন্ধু!" তাহার পর দুইজনে অনেক কথা হইল। তখন স্থির হইল পরদিন প্রাতঃকালে বিপিন বাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে হইবে।

অধর বলিল "তুই নিজে বল্‌তে পারবি ত? না আমি বল্‌ব?"

বসির বলিল "না, না, আমিই বল্‌তে পারব। তিনি আমায় বাচিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন! তাকে আমি খুব ব'ল্‌তে পারব। তাঁর কাছে সব না ব'লে কি থাক্‌তে পারি? এ দুনিয়ায় তুই আর তিনি——আর আমার কেউ নেই ভাই, কেউ নেই!" এই বলিয়া বসির বালকের মত কাঁদিতে লাগিল।

অধর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শেষে বলিল "চল, বাড়ী যাই। কাল সকালে তোকে সঙ্গে ক'রে আস্‌ব। আমার সুমুখেই তুই বাবুকে সব কথা খুলে বলিস্;—তারপর তিনি যা পরামর্শ দেন তাই করা যাবে।" এই বলিয়া দুইজনে নৌকা ছাড়িয়া অধরের মামার বাড়ীতে চলিয়া গেল। সে রাত্রিতে আর তাহাদের ঘুম

হইল না; সমস্ত রাত্রি তাহারা কত রকম কল্পনা করিতে লাগিল।

প্রাতঃকালে তাহারা দুইজনে কাছারীতে আসিয়া দেখে বিপিন বাবু কাছারীতে বসিয়া আছেন। তখন আর তাঁহাকে কিছু বলা হইল না। একটু পরেই কি কার্য্যোপলক্ষে বিপিন বাবু তাঁহার শয়ন-ঘরে গমন করিলেন। এই উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া অধর সেই ঘরের দ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল।

অধরকে দেখিয়াই বিপিন বাবু বলিলেন "কিরে অধরা, কি চাস্?"

অধর বলিল "বাবুজি, একটা কথার জন্যে এসেছি।"

বিপিন বাবু বলিলেন "কি কথা রে?"

অধর বলিল "একটু নিরিবিলি শুন্‌তে হবে, বসিরের সব কথা মনে পড়েছে।"

বিপিন বাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "অ্যাঁ, সব কথা মনে পড়েছে? কখন মনে হোলো, কি ক'রে হোলো?"

অধর বলিল "আজ্ঞে, কা'ল রাত্রিতে স্বপন দেখে ওর সব কথা মনে পড়েছে।"

বিপিন বাবু বলিলেন "ওঃ! বুঝেছি। তাই বুঝি স্বপ্ন দেখে উঠেই কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তা, বেশ। বসিরকে ডাক্ ত; তার মুখেই সব শুনি।" এই বলিয়া বিপিন বাবু একখানি আসন টানিয়া দ্বারের নিকট বসিলেন।

বসির তখন বিষণ্ণ বদনে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপিন বাবু বলিলেন "বসির, বোস; আমাকে সব কথা খুলে বল। যাক্, এতদিন পরে তোমার একটা কিনারা করতে পারব।"

বসির দ্বারের বাহিরে বসিয়া একে একে সমস্ত কথা বলিল, একটুও গোপন করিল না। তাহার পর গত রাত্রিতে সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাও বলিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া বিপিন বাবু বলিলেন "স্বপ্নে যা দেখেছ, সেটা কিছু নয়। মানুষ কি এমন পশু হ'তে পারে?"

বসির বলিল "বাবুজি, আগে হ'লে কোন কথাই বিশ্বাস হোতো না; এখন মনে হচ্চে, সে সবই কোরতে পারে।"

বিপিন বাবু বলিলেন "বসির, ব্যাকুল হোয় না। ভগবান অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে। অদৃষ্টের হাত কে এড়াতে পারে? সে কথা যাক্। এখন কি করা স্থির কোরেছ?"

বসির বলিল "আমি কিছুই স্থির করি নেই। আপনি আমার প্রাণ দিয়েছেন, আপনি আমার মা বা'প; আপনি যা বল্‌বেন, আমি তাই করব।"

বিপিন বাবু বলিলেন "সব কথা শুনে আমার বেশ বোধ হচ্চে যে, তোমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই, থাক্‌তেই পারে না। তবে এই পাঁচ ছয় মাসে তাদের কি অবস্থা হয়েছে সেটা এখনই জানা দরকার। দেখ, আমি বলি কি, তুমি সরকারী নৌকা নিয়ে দেশে যাও। সেখানে প্রকাশ হোয়ো না। কি জানি পাষণ্ডের মনে কি আছে! সে হয় ত তোমাকে মেরেও ফেল্‌তে পারে। খুব গোপনে গ্রামে গিয়ে সব অবস্থা দেখ। তারপর তোমার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে এখানে চ'লে আস্‌বে! কাউকে কিছু জান্‌তে দেবে না।"

অধর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। সে তখন বলিল "এই পাঁচ ছয় মাসে তাদের কি হয়েছে, কে জানে। যদি তারা গাঁ ছেড়ে

চ'লে গিয়ে থাকে, বৌ যদি তার বাপের বাড়ী গিয়ে থাকে, তা হ'লে সেখানে ত প্রকাশ হ'তে পারে।"

বিপিন বাবু বলিলেন "না, কোথাও প্রকাশ হয়ে কাজ নেই। ওর স্ত্রীর কথা যা শুন্‌লাম তাতে আমার বেশ বিশ্বাস হচ্চে, সে সতী লক্ষ্মী। গোপনে তার সঙ্গে দেখা ক'র তাকে নিয়ে আস্‌তে হবে। হয় ত এতদিন তার একটা ছেলে কি মেয়েও হয়েছে। দেখ, বদ্ লোকের অসাধ্য কাজ নেই। যে লোক এমন কাজ ক'রতে পারে, সে না পারে কি?"

অধর বলিল "বসির একা গিয়ে কি পারবে! আপনি যদি হুকুম দেন তবে আমিও ওর সঙ্গে যাই। দুজন হ'লে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে।"

বিপিনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "এক বন্ধুর সঙ্গে ধান কাট্‌তে এসে ত এই দশা; আবার এক বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে আর কিছু না হয়! তা বেশ, অধর, তুই-ই সঙ্গে যাবি। কিন্তু খুব সাবধান, কোন কথা যেন প্রকাশ না হয়। আর বিলম্ব ক'রেও কাজ নেই; কা'লই তোরা রওনা হয়ে যাবি। যা খরচপত্র লাগে আমি আজ রাত্রিতে দিয়ে দেব। এখানে যা বল্‌তে হয় তা আমিই বল্‌ব। আর তোদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তা হ'লে বলিস্ যে, বসিরের গ্রামের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তাই তাকে সেখানে রেখে আসতে যাচ্ছিস্।"

[১৯]

তাহাই হইল। পরদিন সকালের জোয়ারে অধর ও বসির নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা যখন কিছু দূর গিয়াছে তখন অধর গান ধরিল—

"মন মাঝি, ঘাট চিনিয়ে লাগাস্ তরি,
গোল করিলে পড়বি মারা।
নৌকোতে মাল্লা ছজন, কেউ নয় সুজন,
কুজনের বেহদ্দ তারা ;
ছজনে ছদিক টানে, ছগাছ গুণে,
কোন্ দিনে বা ডুবায় ভরা।
শোন রে, মন ব্যাপারী, কই তোমারি,
এবার ব্যাপার হ'ল সারা ;
মহাজন ভিন্ন এই, জীর্ণ তরি
অন্যের কাছে দিস্‌নে ভাড়া।"

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই ফতেপুরের অনতিদূরে নৌকা পৌছিল। বসির বলিল, "ভাই অধর, ঐ কালো গাঁখানি ফতেপুর, ঐ আমাদের গাঁ।" এই বলিয়াই বসির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

অধর বলিল "বসির, তুমি ভয় করছ কেন? তুমি কি ভগবান মান না, তোমার আল্লা মান না। যিনি এত বিপদ থেকে তোমাকে বাঁচিয়েছেন, তিনি সব ভাল ক'রবেন। তোমার মা স্ত্রীকে তুমি নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। এখন এক কাজ কর,

তুমি নৌকার মধ্যে গিয়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক ; কি জানি গাঁয়ের কাছে এসেছি, কেউ যদি তোমায় দেখে ফেলে। এখন এই পাশের অঘাটেই নৌকা লাগাই। একটু আঁধার হলে গাঁয়ের কোলে যাওয়া যাবে।"

তাহারা সেই স্থানেই নৌকা লাগাইয়া অন্ধকারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। বসির নৌকার মধ্যে কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু গৃহে ফিরিবার জন্য, মাতা ও স্ত্রীকে দেখিবার জন্য তাহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। একটু পরেই যখন আঁধার হইয়া আসিল তখন তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

ফতেপুরের ঘাটের নিকটে নৌকা পৌঁছিলে অধর বলিল "বসির ভাই, তুমি নৌকাতেই থাক, আমি উপরে যাইয়া আগে খোঁজ লইয়া আসি, তার পর দুইজনে একসঙ্গে যা হয় করা যাবে।" ইতঃপূর্ব্বেই অধর বসিরের নিকট তাহার বাড়ী গ্রামের কোন্ দিকে, ঘাট হইতে কি করিয়া যাইতে হইবে, সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছিল।

বসির বলিল "ভাই, আমার প্রাণ কেমন কোরছে ; আমিও তোমার সঙ্গেই যাই।"

অধর বলিল "সেটা ভাল হবে না। এত কষ্ট পেয়েছ, আর আধঘণ্টা সইতে পারবে না। আমি যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্ব। শুধু একটু খবর নেওয়া মাত্র।"

এই বলিয়া অধর নৌকা হইতে নামিয়া গেল। রাত্রি অন্ধকার হইলেও বসির যে পথ বলিয়া দিয়াছিল তাহা চিনিয়া লইতে অধরের বিশেষ অসুবিধা হইল না। অধর কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া ঠিক বসিরের বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু আগেই

বাড়ীতে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য মনে করিল না। বসিরের বাড়ীর অনতিদূরেই আর একটা বাড়ী ছিল। অধর সেই বাড়ীর দিকে গেল। রাস্তার উপর হইতেই সে শুনিতে পাইল, ঐ বাড়ীর বাহিরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া কয়েকজন লোক কথা বলিতেছে।

অধর তখন ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর উঠানে গিয়া বলিল "বাড়ীতে কে আছ ?"

বারান্দা হইতে উত্তর দিল "কে ?"

অধর বলিল "পথ-চল্‌তি লোক।"

বারান্দা হইতে উত্তর হইল "বাড়ী কোথায় ?"

অধর বলিল "রসুলপুর।" রসুলপুরে বসিরের শ্বশুর-বাড়ী।

আবার প্রশ্ন হইল "কোথায় যাবে ?"

অধর বলিল "বাড়ীতেই যাব। এই দিকে এসেছিলাম, সঙ্গে নৌকা আছে। বাড়ী থেকে যখন আসি তখন মতি বিশ্বেস ব'লে দিয়েছিল যে, ফতেপুরের নীচে দিয়েই ত নৌকা আস্‌বে, আমি যেন তার মেয়ের খোঁজটা নিয়ে আসি। তা, আস্‌তে আস্‌তে রাত হ'য়ে গেল। একবার ভাবলাম আর নামব না। শেষে মনে করলাম, বিশ্বেস এত ক'রে বলে দিয়েছিল, তার মেয়ের খোঁজটা নিয়েই যাই। তা' কখন ত এ গাঁয়ে আসি নেই, বসির সেখের বাড়ী চিনিনে।" এই বলিতে বলিতে অধর বারান্দায় উঠিল।

যাহারা বসিয়া ছিল তাহাদের একজন বলিল "বসিরের বাড়ী খোঁজ করছ, এই পাশের বাড়ীই বসিরের।"

অধর বলিল "বসির ত আর নাই ; বাড়ীতে সবই মেয়েমানুষ। গাঁয়ের মধ্যে বড় ঘুরেছি। এখানেই একটু তামাক খেয়ে যাই।" এই বলিয়া অধর বারান্দার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার

উদ্দেশ্য এই স্থান হইতেই বসিরের বাড়ীর :সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে।

তখন একজন বলিল "বোস, বোস, তামাক সাজা হচ্চে।" অধর তখন ভাল করিয়া বসিয়া বলিল "বসির ত মারা গেছে, ওর সংসার চোল্‌ছে কেমন কোরে ?"

একজন বলিল "ওদের বড় কষ্ট গো, বড় কষ্ট। বৌটা বড় ভাল ; অমন মেয়ে হয় না। তার বাপ ভাই কতবার নিতে এসেছিল, তা গেল না, বল্লে কি সোয়ামীর ভিঁটে ছেড়ে যাবো না। ঐ আমাদের করিম বৌটাকে নিকে করতে চেয়েছিল, কিছুদিন খরচপত্রও চালিয়েছিল। শুন্‌লাম বৌটা কিছুতেই নিকে করতে চায় নি। নসিব খারাপ হ'লে কি না হয়। ছোঁড়াটা সাহায্য কোরত ; তা সেও আজ দুইমাস হোলো পাগল হয়েছে। কত কি করা হোলো, শক্ত পরীতে নাগাল নিয়েছে, কিছুই হোলো না, এমন ধন্দ পরীরে তাকে পেয়েছে। আহা ! এমন যোয়ান ছেলে !"

অধর দেখিল কথাটা আর একদিকে যায় যায় হইয়াছে ; তখন সে বলিল "তাই ত বড় কষ্ট। এখন বৌটার চলে কেমন কোরে ?"

সেই লোকটাই উত্তর করিল "বৌটা আমীর মণ্ডলের বাড়ী দুবেলা রাঁধে। যা ভাত পায় তাই শাশুড়ী বৌয়ে খায়। আবার একটা ছেলে হয়েছে। মণ্ডলেরা বৌটাকে খুব ভালবাসে; তারা একটু দুধ দেয়, তাই ছেলেটা খায়। আর বাড়ীতে তরিটা তরকারীটা যা হয় তাই হাটে বেচে যে দুচার পয়সা পায়, তাই দিয়ে কোন রকমে দিন চালায়।"

অধরের হাতে তখন কলিকা আসিয়াছে; অধর তামাক খাইতে খাইতে বলিল "বৌটা বাপের বাড়ী গেলেই পারে, মতি বিশ্বেসের অবস্থা ত ভাল। সে একটা কেন পাঁচটা মেয়েকে পুষ্‌তে পারে।"

সেই লোকটী বলিল "আমরাও ত তাই বলি। কিন্তু এত যে কষ্ট, পরের ঘরে বাঁদীগিরি করছে, তবু বাপের বাড়ী যাবে না; বলে বুড়ীর কি হবে। বলে সোয়ামীর ভিঁটেয় পড়ে না খেয়ে মরব, তবুও বাপ ভাইয়ের গলায় পড়তে যাব না। মেয়েটী বড় ভাল, ভারি নরম সরম; তা না হ'লে কি আমীর মণ্ডল এত সাহায্য করে।"

অধরের যাহা জানিবার ছিল তাহা সে জানিতে পারিল। সে তখন বলিল "রাত হয়ে যাচ্ছে; তবে এখন উঠি। মেয়েটীকে একবার দেখেই নৌকায় চলে যাই।" এই বলিয়া অধর ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইল। তখন সে তাড়াতাড়ি নৌকায় চলিয়া গেল।

বসির নৌকার মধ্যে বসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। অধর নৌকায় উঠিয়াই বলিল "বসির ভাই, যা বলেছিলাম সব ঠিক। সবাই বেঁচে আছে, ভাল আছে। তোমার একটী বেটাছেলে হয়েছে।" তাহার পর সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। বসির আনন্দে অধীর হইয়া অধরের গলা জড়াইয়া ধরিল।

তাহার পর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দুইজনে ভাল করিয়া খাইল। তামাক খাওয়া হইলে অধর বলিল "এখন চল। তাদের নিয়ে এই রাত্রির ভাটাতেই নৌকা ছাড়তে হবে। ভাটা পড়বার আর বিলম্ব নেই।"

তখন দুইজনে তীরে উঠিয়া বসিরের বাড়ীর দিকে গেল। বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হইয়া অধর ডাকিল "বাড়ীতে কে আছ গো?"

বসিরের স্ত্রী তাহার শাশুড়ীকে বলিল "ওগো, কে যেন ডাক্‌ছে।"

বসিরের মা ঘরের মধ্যে হইতেই বলিল "এত রাত্রে কে ডাকে গো?"

অধর মিথ্যা কথা বলিল; সে বলিল "আমরা রসুলপুর থেকে আসছি।"

বাপের বাড়ীর গ্রামের নাম শুনিয়াই বসিরের স্ত্রী বলিল "মা, আমার বাপের গাঁ থেকে কে এসেছে; উঠে দেখ ত?"

বুড়ী তখন উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। বাহিরে অন্ধকার, বুড়ী কিছুই দেখিতে পাইল না। সে তখন বলিল "কৈ গো, তোমরা কোথায়?"

বসির তখন বারান্দায় উঠিয়াছে। সে তখন আর স্থির থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল "মা, আমি এসেছি।" বসির দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

বুড়ী ভয়ে কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, সে আতঙ্কে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল!

বসির তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "মা, ও মা, আমি বসির! চিন্‌তে পারছো না?"

"বসির!" এই বলিয়াই বুড়ী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বসির তখন তাহার স্ত্রীকে বলিল "শীঘ্র জল আন।" এই বলিয়াই সে তাহার মাতার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিল। তাহার স্ত্রী এতক্ষণ

নির্ব্বাকভাবে বসিরের দিকে চাহিয়াছিল। যখন দেখিল ইহা স্বামীর প্রেতাত্মা নহে স্বামী, তখন সে দ্রুতপদে জল আনিতে গেল।

[২০]

সেই দিন রাত্রিশেষেই একখানি ডিঙ্গী নৌকা জোর ভাটার টানে ফতেপুরের নদী বহিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছিল। একে ভাটার টান, তাহার উপর ডিঙ্গীর পালে বাতাস পাইয়াছে; নৌকা একেবারে তীরবেগে ছুটিতেছে। একটী যুবক সেই ডিঙ্গীর হা'ল ধরিয়া বসিয়া আছে। এ ডিঙ্গীর মাঝী স্বয়ং অধর।

নৌকার মধ্যে বসিরের মা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তাহার কোলের কাছে বসিরের ছেলেটী ঘুমাইতেছে। ছেলের পার্শ্বেই বসিরের স্ত্রী বসিয়া আছে। তাহার কি আজ ঘুম হয়—আজ নিদ্রাদেবী তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এমন সুখের দিন কি মানুষের জীবনে কখন হয়! চাষার মেয়ে, হৃদয়ের কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে জানে না। তাহার মনে তখন যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা কথার দ্বারা বলাও যায় না, তাহা শুধু অনুভব করিতে হয়! যে স্বামীকে সে মৃত মনে করিয়া এই কয়মাস কাটাইয়াছে, এ জীবনে যাহাকে জীবিত দেখিবার আশা তাহার ছিল না, দিবানিশি যাহার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল, সেই বসির—সেই আরাধ্য দেবতা—তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ফিরিয়া আসিয়াছে। আজ সে তাহার সেই স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার কথা শুনিতেছে!

এমন অদৃষ্ট কি কাহারও হয়? বসিরের স্ত্রী বসিয়া বসিয়া স্বামীর বিপদের কথা শুনিতেছে; এক একবার তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে, আবার মনে মনে সে আল্লাকে সহস্র ধন্যবাদ করিতেছে।

বসির তাহার কাহিনী অনেকটা বলিয়া গেলে, তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল "তোমার আমাদের কথা সব ভুল হ'য়ে গিয়েছিল, কিছুতেই মনে কোরতে পারতে না। তারপরে কেমন ক'রে মনে হল?"

বসির বলিল "সেই কথাই ত এখন বলব। সে অতি ভয়ানক কথা; সে কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না। এমন সর্ব্বনেশে কথা!" এই বলিয়া সে সেই রাত্রির স্বপ্ন-বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল; তাহার স্ত্রী নির্ব্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার কথা শেষ হইলে তাহার স্ত্রী বলিল "এ স্বপন কবে দেখেছিলে মনে আছে?"

বসির বলিল "খুব মনে আছে; আজ হোলো শনিবার, এর আগের রবিবারে রাত্রি নটা দশটার সময় স্বপন দেখেছিলাম। সেই স্বপন দেখার পরই ত সব কথা মনে হোল।"

বসিরের স্ত্রী বলিল "কি তাজ্জব কথা, এমন ত কখন শুনি নেই, কেউ কোন দিন শোনে নাই। তুমি শুন্‌লে কি বোল্‌বে জানিনে, ঠিক ঐ দিনে ঐ সময়ে ঠিক অমনি ক'রে করিম আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছিল। তুমি যা যা বল্লে ঠিক ঐ রকম সব হোয়েছিল। আরও এক কথা শুন্‌বে। যখন আমি আল্লা আল্লা ব'লে ডেকে উঠলাম, ঠিক তখনই করিম দুয়োরের দিকে কেন যেন চাইল। তারপরই একটা ভয়ানক শব্দ ক'রে সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে, হাতের দাখানি ফেলে দিয়ে পালাল। তা, তুমি তার

নাম ধোরে ডাক্‌লে কোন্ দেশ থেকে, সে কি সেই ডাক শুন্‌তে পেয়েছিল। এমন কথা ত কখন শুনিনি।"

বসির বলিল "আমি স্বপনে যা দেখেছিলাম, ঠিক তাই হ'য়েছিল?"

তাহার স্ত্রী বলিল "ঠিক তাই, একটা কথাও অমিল হয় নেই। কি আশ্চয্যি কথা, এমন ত কোন দিন শুনি নেই।"

বসির বলিল "দেখ, আমিও কিছুই বুঝতে পারছি না। এ সবই আল্লার মরজি। তা না হ'লে বিষ খেয়ে কে কবে বেঁচেছে, বাদার গাঙ্গে পড়ে কুমীরের হাতে থেকে কে কবে বেঁচেছে, বাদার জঙ্গলে বাঘেও খেলে না। তারপর সেই জঙ্গলে এত ডাক্তার কব্‌রেজ কার নসিবে ঘটে, এমন দয়াল বাবু জঙ্গলে কে পায়, অধরের মত এমন দোস্ত কার মেলে? সব আল্লার মরজি, আর সব তোমার নসিব, বৌ, সব তোমার নসিব!" এই বলিয়া বসির তাহার স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিল; মা যদি নৌকার মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে সে তাহার স্ত্রীকে বুকে চাপিয়াই ধরিত।

বসিরের স্ত্রী বলিল "সব সেই আল্লার দোয়া। আমরা কি? আল্লা যে এমন ক'রবেন তা কোন দিন স্বপনেও ভাবি নেই। কিন্তু দেখ, আমার থেকে থেকেই তোমার সেই স্বপনের কথা মনে হচ্চে; আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে। আরও দেখ, তার পরদিন থেকেই করিম পাগল হ'য়ে গেল! কি আশ্চয্যি!"

বসির তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "করিম যে এমন হবে, তা আমি কোন দিনই ভাবি নেই। আহা! সে যাই করুক, তার এখনকার কথা শুনে বড়ই কষ্ট হচ্চে। হায় হায়! কেন তার এমন মন হ'ল; কেন তার ঘাড়ে এমন সয়তান

ভর কোরলো! মা বল্‌ছিল, তারে পরীতে নাগাল নিয়েছে। তা নয়, তার উপর সয়তানের ভর হ'য়েছে। তা না হলে মানুষ কি এমন কাজ করতে পারে। আর যে সে মানুষ নয়—করিম।" বসির আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

সেই সময় ডিঙ্গীর হা'লে বসিয়া অধর গান ধরিল—

"কত ভালবাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধর্‌তে নারি, তোমায় দুটী হাত বাড়ালে।
ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে
হায় রে;—
তখন আহার দিয়ে বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে।
আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হলেম, মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলাম,
হায় রে;—
মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে।
দিলে বন্ধুবান্ধব দারা সুত, ও নাথ, এ সব কৌশল তোমারি ত,
হায় রে;—
পেলাম ধনধান্য সহায় সম্পদ, সবি তোমার দয়া বলে।
তোমার দয়ায় সকল পেলাম, কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম,
হায় রে;—
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে, আমি কাঁদলে কর কোলে।
দেখা নাহি দেবে আমায়, এই ইচ্ছা যদি ছিল তোমার,
হায় রে;—
ওগো তবে কেন শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঙ্গালে।"

গভীর রাত্রি, অন্ধকার, জনমানবশূন্য ; নদীর মধ্যে নৌকা নাই ; কেবল এই ডিঙ্গীখানি ছোট একখানি পা'ল তুলিয়া দিয়া ভাটি গাঙ্গে ছুটিতেছে ; আর সেই ডিঙ্গীর হা'ল ধরিয়া অধর প্রাণ খুলিয়া তন্ময় হইয়া গান গাইতেছে। ডিঙ্গীর মধ্যে বসিয়া বসির ও তাহার স্ত্রী নির্ব্বাক হইয়া এই গান শুনিতে লাগিল। তাহারা চাষা হইলে কি হয়, অধর নিরক্ষর কৈবর্ত্তের ছেলে হইলে কি হয় ; তাহাদের প্রাণ যে আজ স্বর্গের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহারা যে আজ ভগবানের কৃপা অযাচিতভাবে ভোগ করিতেছে। তাহারা তখন কি আর এ শোকতাপ বিপদ আপদপূর্ণ পার্থিব জগতে আছে। অধরের সে কাতরকণ্ঠের ধ্বনি নিশ্চয়ই ভগবানের চরণে পৌঁছিতেছে, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই কাঙ্গালের ঠাকুর তাঁহার এই দীন দরিদ্র ভক্তের নিবেদন শুনিতেছেন। এমন করিয়া এমন সময়ে এমন গান গাইলে তাঁহার আসন টলিবেই টলিবে।

অধরের গান থামিলে বসির নৌকা হইতে বাহির হইল। সে তখন বলিল "অধর ভাই, আর একটা গান গা না ভাই! তোর গানের মধ্যে কি যেন আছে।"

অধর হাসিয়া বলিল "বসির ভাই, ডিঙ্গীর মধ্যে তোর যা আছে, তার থেকে বেশী এ দেশে আর কিছুই নাই। আল্লা বল, খোদা বল, দুর্গা বল, কালী বল, সবই ঐ।"

বসির কথাটা বোধ হয় বুঝিল না ; সে বলিল "তা হোক্, তুই আর একটা গান গা। তোর গান শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে।"

অধর বলিল "তোর ভাল লাগুক, আর না লাগুক, গান গেয়ে আমার মনটা যেন হাল্‌কা হয়। আমি সুখের সময়ও গান গাই, কষ্টের সময়ও গান গাই।" এই বলিয়া সে আবার গান ধরিল—

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এই যে সব আমার আমার, সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটী রবে ;
হ'লে সব খেলা সাঙ্গ, সোণার অঙ্গ
ধূলায় গড়াগড়ি যাবে।
ওরে ভাই ক'রে খেলা, গেছে বেলা,
এই রেতের বেলা আর কি হবে ;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খণি,
তিনিই 'মশার' ভরসা ভবে।

গান শেষ হইলে বসির বলিল "অধর ভাই, তুই একটু শো ; আমি খানিকক্ষণ হা'ল ধরি। তুই যে একটুও ঘুমাতে পারলি নে ; শেষে জ্বর টর হবে।"

অধর বলিল "আরে ভাই, শোবার দিন কত পাব ; আজকের মত·চড়ন্দার ত আর পাব না। একটা রাত না ঘুমুলে কি হয় ? তুই ত আমাদের শাস্তর জানিস্ নে। আমাদের রামায়ণে আছে, রাম যে চোদ্দ বছর বনে ছিল, সে চোদ্দ বছর ভাই লক্ষ্মণ ঘুমায় নাই, খায় নাই ; না খেয়ে না ঘুমুয়ে চোদ্দ বছর কাটিয়েছিল ; তাই রামের সীতা উদ্ধার হোয়েছিল। আর আজ আমিও সীতা উদ্ধার কোরে নিয়ে যাচ্ছি, আমি কি আর দুইটা রাত না ঘুমিয়ে পারবো না ? দেখ্, গোকুলপুরে নিয়ে গিয়ে তোদের আমরা জেতে তুলে নেব।"

অধরের কথা শুনিয়া বসির হাসিতে লাগিল।

উপসংহার।

আমাদের কথা প্রায় শেষ হইয়াছে। তবুও দুই একটা কথা বলি। যথাসময়ে বসির সপরিবারে গোকুলপুরে পৌঁছিল। তাহাদের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বিপিনবাবু ও কাছারীর সকলেই বসিরের স্ত্রীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিপিনবাবু নিজের খরচে বসিরের বাসের জন্য রামমোহন মাঝীর বাড়ীর নিকট একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিলেন, লাঙ্গল গরু কিনিয়া দিলেন, সরকার হইতে কিছু জমি দিলেন। বসির সপরিবারে সেখানে বাস করিতে লাগিল। তাহার ছেলেটী অধরের এমন বাধ্য হইয়া পড়িল যে, অনেক সময়ে অধরের কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইত।

বসিরের গোকুলপুরে আসিবার পর প্রায় তিনমাস কাটিয়া গিয়াছে, এমন সময় একদিন বসির একজন লোকের নিকট শুনিতে পাইল যে, গোকুলপুর হইতে দুই মাইল ভাটীতে একটা পাগল আসিয়াছে। সে নদীর তীরে দিনরাত্রি কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়। সে কাহারও সঙ্গে কথা বলে না; গাছের পাতা ফলমূল যা পায় তাই খায়, আর নদীর তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বসির তাহাকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "ভূতের মত চেহারা, মাথায় কতকগুলো চুল, ছেঁড়া ময়লা একখানা লেংটী পরা।"

বসির বলিল "সে কি কারো সঙ্গে কথা বলে না?" লোকটী বলিল, "কারো সঙ্গেই কথা বলে না; নিজেই কি যেন বিড় বিড় করে; আর মধ্যে মধ্যে 'করিম' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠে।"

এই কথা শুনিয়া বসির আর স্থির থাকিতে পারিল না। তখনই

সে অধরের কাছে গেল এবং সমস্ত কথা তাহাকে জানাইয়া বলিল "অধর, চল, সেই পাগলাকে নিয়ে আস্‌তে হবে। করিম আমার যাই করুক না কেন, আহা সে যে পাগল হয়েছে; সে যে পথে পথে বেড়াচ্ছে। চল, তাকে ঘরে নিয়ে আসি।"

অধর সম্মত হইল। কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তাহারা দুইজনে নদীর তীর ধরিয়া চলিল। কিছু দূর যাইয়াই দেখে করিম নদীর তীরে কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া বসিরের প্রাণ গলিয়া গেল। সে দৌড়িয়া করিমের নিকট উপস্থিত হইয়া ডাকিল "করিম!" করিমও তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "করিম!" তাহার পরই ফিরিয়া চাহিয়া দেখে বসির তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। করিম তখন এক দৃষ্টিতে বসিরকে দেখিতে লাগিল; তাহার চাহনি দেখিয়া অধরের ভয় হইতে লাগিল।

বসির ডাকিল "করিম!" করিম চমকিয়া উঠিল, তাহার পর একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া সে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল।

অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া অধর ও বসির তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিল। বসিরের স্ত্রী করিমের এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বের কথা সমস্তই ভুলিয়া গেল। তখন স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া করিমের গা হাত পা ধোয়াইয়া দিল; করিম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বসির ও তাহার স্ত্রীর একটা কাজ বাড়িল—এই পাগলের সেবা করা। পাগল খাইতে চায় না, স্নান করিতে চায় না, কোথায় যাইবার চেষ্টা করে না, শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। বসিরের স্ত্রী তাহাকে প্রত্যহ স্নান করাইয়া দেয়, নিজের হাতে তাহাকে

খাওয়াইয়া দেয়—সে আর কাহারও হাতে খায় না। পূর্ব্বকথা ভুলিয়া গিয়া বসিরের স্ত্রী এই পাগলকে ছেলেমানুষের মত লালন পালন করিতে লাগিল। তাহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ যত্ন তাহার ছেলে ও এই পাগল সমভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। পাগল দিনরাত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, শুধু মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে

"করিম"

সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের

অন্যান্য পুস্তক।

হিমালয়

(চতুর্থ সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর পুস্তকের নাম করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে 'হিমালয়ের' কথা বলিতে হয়। এই পুস্তকখানি লিখিয়া জলধর বাবু যদি তাঁহার লেখনীকে একেবারে বিশ্রাম দিতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-লেখক বলিয়া সাহিত্য-জগৎ অভ্যর্থনা করিত। হিমালয়ের চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে, হিমালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য-পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছে, হিমালয় লিখিয়া জলধরবাবু ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গলা-সাহিত্য লাভবান হইয়াছে। এমন সুন্দর পুস্তক ঘরে ঘরে ঘরে কর্ত্তব্য। সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য পাঁচ সিকা (১।০) মাত্র।

প্রবাস-চিত্র

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রবাসের কথা জলধর বাবু ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। প্রবাস-চিত্র বাঙ্গলা-সাহিত্যের একখানি অমূল্য রত্ন। যেমন বর্ণনা-কৌশল, তেমনই ভাবের প্রবাহ, তেমনই ভাষার মাধুর্য্য; পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইতে হয়। মূল্য এক টাকা মাত্র।

পথিক

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পথিকে জলধর বাবু অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার পথিক পড়িলে সত্য সত্যই মনে হয়, আমরা সকলেই পথিক— দুইদিন পরে দেশে চলিয়া যাইব। যিনি লোকের হৃদয়ে এমন অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন, তিনি যে একজন উচ্চ-শ্রেণীর লেখক তাহা আর বলিতে হইবে না। সুন্দর কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য এক টাকা মাত্র।

হিমাদ্রি

হিমাদ্রি 'হিমালয়েরই' স্কুলপাঠ্য সংস্করণ। হিমালয় চলিত ভাষায় লিখিত, হিমাদ্রি সাধুভাষায় লিখিত; কিন্তু পড়িতে বসিলে ইহাকে নূতন পুস্তক বলিয়া মনে হয়। হিমালয়ের বর্ণনা এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে ও ওজস্বিনী ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। ছাত্রগণের পাঠ্য বলিয়া ইহার মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র বার আনা।

পুরাতন পঞ্জিকা

পঞ্জিকা কখনও পুরাতন হয় না; কিন্তু জলধরবাবু অনেকদিন পরে, হিমালয়ের কথা এই পুস্তকে বলিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম 'পুরাতন পঞ্জিকা' রাখিয়াছেন। এখানি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পরিশিষ্ট বলিলেই হয়। হিমালয়, প্রবাস-চিত্র, পথিক, হিমাদ্রি এবং এই পুরাতন পঞ্জিকা—এই পাঁচখানি পুস্তক একসঙ্গে পড়িলে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়, জলধর বাবু যে সত্য সত্যই বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখক তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুন্দর বাঁধাই, পুরাতন পঞ্জিকার মূল্য অতি সুলভ, বার আনা মাত্র।

নৈবেদ্য

এখানি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। নৈবেদ্য প্রকৃতই নৈবেদ্য; ইহা দেবভোগ্যই বটে। যিনি জলধর বাবুর নৈবেদ্য পড়িবেন, যিনি তাঁহার অন্ধের কাহিনী, প্রতীক্ষা প্রভৃতি গল্প পড়িবেন তিনিই একবাক্যে বলিবেন জলধর বাবু ছোট গল্প লিখিতে কেমন সিদ্ধহস্ত, তিনি পাঠকের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারেন। মূল্য আট আনা মাত্র।

ছোটকাকী

জলধর বাবুর ছোটকাকী কয়েকটী গল্পের সমষ্টি। ছোটকাকী তাহার প্রথম গল্প। এক ছোটকাকী গল্পটী পড়িলেই পুস্তক-ক্রয় সার্থক বলিয়া মনে হইবে। এই সংগ্রহের গল্পগুলি পড়িলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে, হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে, আর গ্রন্থকারকে সহস্রমুখে প্রশংসা করিতে হয়। সুন্দর বাঁধাই পুস্তকের মূল্য বার আনা মাত্র।

নূতন গিন্নী

বহু পুরাতন হইলেও গিন্নী চিরদিনই নূতন। কিন্তু তাহা ভাবিয়া এ পুস্তকের নামকরণ হয় নাই। নূতন গিন্নীর ইতিহাস সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। আজকাল দেশের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এই পুস্তকখানি কর্ত্তা, গিন্নী, বৌ এমন কি সকলেরই পড়া কর্ত্তব্য। মূল্য দশ আনা মাত্র।

দুঃখিনী

একটী বালবিধবার সুন্দর চিত্র। এই পুস্তকখানি জলধর বাবু ১৫ বৎসর বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন; এখন পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি বলেন, তাঁহার হাত দিয়া বালবিধবার এমন সুন্দর কাহিনী আর বাহির হইতে পারে না। ঘরে ঘরে দিন-পঞ্জিকার মত এই পুস্তকখানি পঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য বার আনা মাত্র।

আমার বর

অলৌকিক—কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

বাঙ্গলা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি আপনার শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া বাঙ্গলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তিনি বহু গল্পপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সুধী-সমাজে তাহা সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার এই নূতন গল্পপুস্তক "আমার বর" ভাষার ললিত-বিন্যাসে, বর্ণনার চারুচিত্রে, গল্প বলিবার মোহিনী ভঙ্গীতে এই শ্রেণীর অপর গ্রন্থসমূহকে অতিক্রম করিয়াছে, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। জলধরবাবুর গ্রন্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কপটতা নাই, রসবিকার নাই। এই পুস্তক কেন, জলধর বাবুর যে কোন পুস্তক নিঃসঙ্কোচে মা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার হস্তে দেওয়া যাইতে পারে; বাঙ্গলা-সাহিত্যে—এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে—ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে। জলধরবাবুর গ্রন্থের ন্যায় সুরুচি-সম্পন্ন, সারবান ও স্বাস্থ্যবান গ্রন্থ বাঙ্গলা-সাহিত্যে বিরল, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই "আমার বর" পুস্তকখানি সংবাদ-পত্রে ও সুধী-পাঠকগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত। বইখানি প্যারাগন প্রেসে মুদ্রিত, সুতরাং ছাপা সুন্দর। যেমন উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছাপা, তেমনই বহুমূল্য রেশমী কাপড়ে বাঁধাই; তাহার পর আবার ছয়খানি উৎকৃষ্ট চিত্রে এই পুস্তক সুশোভিত, অথচ ইহার মূল্য এই সকলের তুলনায় অতি সামান্য—পাঁচ সিকা মাত্র, ডাকমাশুল তিন আনা।

সীতাদেবী

জনমদুঃখিনী সীতার পবিত্র জীবন-কাহিনী অতি সরল, সুন্দর, অনেক প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া জলধর বাবু তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। বহু সুরঞ্জিত চিত্র-শোভিত, অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই। পুস্তকের তুলনায় মূল্য অতি সুলভ, এক টাকা মাত্র।

বিশুদাদা

(সুবৃহৎ উপন্যাস)

পনর বৎসর বয়সের সময় জলধরবাবু 'দুঃখিনী' উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, আর ৫২ বৎসর বয়সে 'বিশুদাদা' লিখিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট উপন্যাস যখন ধারাবাহিকরূপে 'মানসী' পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, তখন উক্ত পত্রের গ্রাহক ও পাঠকগণ বিশুদাদার পরবর্ত্তী ঘটনা জানিবার জন্য যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইতেই এই পুস্তকের আদরের কথা বুঝিতে পারা যায়। বিশুদাদা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে এই পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন। এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী কাহিনী পড়িলে শুধু যে আনন্দ লাভ হয় তাহা নহে, ইহা পাঠের সময় সত্য সত্যই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কি পাপে আমরা এখন বিশুদাদার মত প্রভু-পরায়ণ, মহানুভব, দেবহৃদয় ভৃত্য, বন্ধু, অভিভাবক পাই না। এই পুস্তকে যে কয়েকটী গান আছে, তাহা অতুল্য, অমূল্য। এই পুস্তক লিখিয়া জলধরবাবু ধন্য হইয়াছেন। "বিশুদাদায়" দুইখানি আলোক চিত্র আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর ছাপা, মনোহর বাঁধাই, মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

কাঙ্গাল হরিনাথ

দশখানা আলোকচিত্র সম্বলিত

মহাত্মা কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদের পবিত্র জীবন-কাহিনী।

(প্রথমখণ্ড)

যাঁহার বিজয়বসন্ত পাঠ করিয়া ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠক অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন, যাঁহার ফিকিরচাঁদের বাউল-সঙ্গীতে একসময় বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল, যাঁহার 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' আত্ম ও সাধনতত্ত্বের অমূল্য রত্নভাণ্ডার, যিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামক সংবাদপত্র প্রকাশিত করিয়া অকুতোভয়ে পল্লীবাসীর সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ জমিদার ও কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার প্রভৃতির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন, নীলবিদ্রোহের সময় যিনি নদীয়া জেলার বিদ্রোহের সংবাদ যথারীতি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত করিতেন, শেষ জীবনে যিনি সাধনপথে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বদা প্রেমানন্দে মগ্ন থাকিতেন, সেই কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর সাধক প্রবর কাঙ্গাল হরিনাথের জীবনকথা প্রথমখণ্ড তাঁহার প্রিয় ছাত্র, ভক্ত শিষ্য জলধর বাবু প্রকাশিত করিয়াছেন। এই খণ্ডে কাঙ্গালের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা এবং তাঁহার বাউলসঙ্গীত ও অন্যান্য গানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং অনেক অপূর্ব্ব-প্রকাশিত গানও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মানসী পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক

অধিক নূতন তথ্য ও নূতন গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত কয়েকখানি আলোকচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। —(১) কাঙ্গাল হরিনাথ, (২) সাধকপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, (৩) শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, (৪) ৺মথুরানাথ মৈত্রেয় (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পিতৃদেব) (৫) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, (৬) কাঙ্গাল হরিনাথের সহধর্ম্মিণী, (৭) কাঙ্গালের কুটীর (৮) কাঙ্গালের স্মৃতি-সভা, (৯) কাঙ্গালের হস্তলিপি (১০) শ্রীযুক্ত জলধর সেন। পুস্তকখানি বৃহদায়তন হইয়াছে; ইহা উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দররূপে ছাপা হইয়াছে; বাঁধাইও মনোরম। এমন কাগজ, এমন ছাপা, এমন বাঁধাই, এত ছবি; কিন্তু জলধর বাবু কাঙ্গালের জীবন-কথার বহুল প্রচার মানসে ইহার মূল্য মাত্র পাঁচ সিকা করিয়াছেন।

একটী কথা

আমরা এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, জলধর বাবুর যে কোন পুস্তক নিঃসঙ্কোচে মা, স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যার হস্তে দেওয়া যাইতে পারে এবং সকলেই জলধর বাবুর যে কোন পুস্তক পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই বলিবেন জলধরবাবু করুণ-কাহিনী বর্ণনে সিদ্ধহস্ত, জলধরবাবুর কোন গ্রন্থে উচ্ছৃঙ্খলতা নাই।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।